জিয়ারতে মক্কা মদীনা

সৈয়দ মবনু

জিয়ারতে মক্কা-মদীনা

সৈয়দ মবনু

জিয়ারতে মক্কা-মদীনা
সৈয়দ মবনু

স্বত্ব
লেখক

প্রকাশকাল
এপ্রিল ২০০৩

প্রকাশক
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
মাকতাবাতুল আশরাফ
(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ০১১ ৮৩৭৩০৮

কৃতজ্ঞতা
নগর
সাহিত্য ও প্রকাশনা সংস্থা

প্রচ্ছদ
মাহফুজ খান
সিটি কম্পিউটার গ্রাফিক্স
মোবাইল : ০১৭১ ৩৮৯২৬৫

কম্পোজ-মুদ্রণ-বাঁধাই
সিটি অফসেট প্রেস
দিলারা ভবন, ১৮/৮ উত্তরণ
বারুতখানা, সিলেট
মূল্য
৪০ টাকা

Jiyarote Mokka-Modina, by Syed Mobnu, Published by
Maktabatul Ashhraf, 50 Banglabazar, Dhaka April 2003,
Price : 40 Taka (Bangladesh), 5 (U.K)

উৎসর্গ

ইন্দো-ইসরাইলী-ইঙ্গ-মার্কিন-রুশ
নির্মমতা-বর্বরতা-হিংস্রতার মোকাবেলায়
জাগ্রত প্রতিটি বিবেকী, বিপ্লবী, বলিষ্ঠ প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর
আফগান, কাশ্মীর, ফিলিস্তিন, চেচনিয়া,ইরাক কিংবা পৃথিবীর সকল আক্রান্ত জনপদের
বাসিন্দা

অবশিষ্ট কথা :

মূল বইয়ে অনেক কথার পর আবার অবশিষ্ট কেন? সর্বদা কিছু কথা অবশিষ্ট থেকে যায় বলে ইতির পর বিঃদ্রঃ দিয়ে বলতে হয় আমার। আরো অনেকের এই অভ্যেস। হজ্ব নিয়ে প্রচুর বই বাজারে আছে। বর্তমান বিশ্বের অবস্থা খুব অশান্ত। মুসলিম নর-নারীর রক্তে পৃথিবীর সবুজ প্রান্তর রঞ্জিত। হজ্ব নিয়ে আমার লেখার ইচ্ছে থাকলেও এই মুহূর্তে মন বসছে না। তাছাড়া একটু ভিন্নভাবে লিখতে চাই বলে মনকে স্থির করার চেষ্টায় আছি। মোহাম্মদ মারুফের সাথে আমার সম্পর্ক সাংস্কৃতিক আন্দোলনে-সাহিত্যে-মানসিকতায় এবং সর্বশেষে ব্যবসায়ও। নিজের বই প্রকাশে উদাসীন হলেও সার্বক্ষণিক আমার পিছনে- প্রথম হজ্বের আবেগ চলে গেলে আর লিখা হবে না, স্মৃতিও প্রতারণা করতে পারে। শেষ পর্যন্ত পান্ডুলিপি শেষ হলো। ধন্যবাদ মারুফকে।

এই বইয়ের কম্পোজ যখন শেষ তখন ইরাককে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠি গ্রাস করে নিয়েছে-তছনছ করে দিয়েছে। খুবই মর্মান্তিক ঘটনা।

মাওলানা হাবিবুর রহমান খান আমার কৈশোরের বন্ধু। প্রকাশনা সংস্থা মাকতাবাতুল আশরাফ দিয়ে ব্যবসা ভালোই জমিয়েছেন হাবিব ভাই। গ্রন্থটি প্রকাশের দায়িত্ব নিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞ করলেন। মাহফুজ খানের প্রচ্ছদের বিচার পাঠকের হাতে, তবে প্রচ্ছদ করতে তার আন্তরিকতা আপনজনের পরিচায়ক। বৌ-বাচ্চা-মা-বাবা-ভাই-বোন আত্মীয় বন্ধুরা তাদের হক্ব বিসর্জন দিয়ে আমাকে লেখালেখিতে সার্বক্ষণিক যে সহযোগিতা করেন তাদের প্রতি আমারও কৃতজ্ঞতা সার্বক্ষণিক।

সৈয়দ মবনু
১০/৪/২০০৩

প্রকাশকের কথা :

সৈয়দ মবনু স্বদেশ-বিদেশে পরিচিত, আলোচিত লেখক। ইতোমধ্যে তার একাধিক গ্রন্থ পাঠকমহলে বেশ সাড়া জাগিয়েছে। বিশেষ করে লাহোর থেকে কান্দাহার গ্রন্থখানি বাংলাদেশের পাঠকসমাজে ব্যাপক জনপ্রিয়তা এনে দিয়েছে। বর্তমান গ্রন্থটি হারামাইন আশশারিফাইন সফরের বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে লিখিত। আমাদের বিশ্বাস এ গ্রন্থটি বিপুল পাঠকপ্রিয়তা পাবে।

সৈয়দ মবনু লেখালেখি করছেন ছোটবেলা থেকে। তার প্রথম গ্রন্থ অঘোষিত ক্রুসেড থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত ৮টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। মানবতার কল্যাণে নিবেদিত উদার ও মহৎপ্রাণ এক ব্যক্তিত্ব সৈয়দ মবনু ব্যক্তিগত জীবনে বিবাহিত ও দুই মেয়ে এক ছেলের গর্বিত পিতা।

গ্রন্থটির মুদ্রণ, বাঁধাই, প্রচ্ছদ ডিজাইন তত্ত্বাবধানে সার্বিক দায়িত্ব পালন করেছে সিলেটের নগর সাহিত্য ও প্রকাশনা সংস্থা। এ সহযোগীতা প্রদানের জন্য তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অনিচ্ছাকৃত ক্রটির জন্য ক্ষমা প্রার্থী।

মাওলানা হাবিবুর রহমান খান
মাকতাবাতুল আশরাফ
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সূচি :

আরবের আদিত্ব- মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশ

মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশে আরবের উপাদেয় উপায়ন ঐতিহাসিক স্বীকার্য। মানুষের সাথে আরবের সম্পর্ক-ঐতিহ্যগত, প্রাচীন, আদি, ক্ষেত্র বিশেষ প্রেমাস্পদ। আরবের বালুরাশি, সাইমুম, লবণাক্ত সামুদ্রিক জল, জলবাস্প, খেঁজুর বৃক্ষ, জমজম কূপের জল, জোৎস্নালোকিত পাহাড়ের হেরা গুহা, পাপ চুষক কালো পাথর-কা'বা ঘর-মক্কা শহর, শান্তির পত্তন মদিনাতুন নববী, বেদুইনজাতি, ধুনো-গুগগুলের সুবাস, আর বাতাসের সাথে একাগ্রচিত্তে মিশে আছে আমাদের আদি আদম-নুহ-সাম-ইব্রাহীম-ইসমাঈল-মুসা-ঈসা-মোহাম্মদ প্রমুখের হাড়, মাংস, চিন্তা, চেতনা। এখানের অসংখ্য মরুপথ ডিঙ্গিয়ে যাত্রা করা পথিকেরা ইতিহাসে পরিচিত ব্যবিলিয়ন, অ্যাসিরিয়, ফিনিশিয়, হিব্রু ইত্যাদি। খ্রিষ্ট পূর্ব ৩৫০০ বছর আগে এই ভূমি থেকে বেরিয়ে আসা একদল মানুষ আরব সাগরের পশ্চিম তটধরে উত্তরাভিমুখের (অথবা পূর্ব আফ্রিকার) পথ দিয়ে নীলনদ উপত্যকায় এসে "হ্যামিটিয়" জনগোষ্ঠীর সাথে একাকার হয়ে যান। ইতিহাসে ওরা-ই মিশরীয়। মানব সভ্যতার প্রথম সোপান তাদের হাতে নির্মিত হয়। তারা প্রথম আবিস্কার করেন সৌর বর্ষপঞ্জি নির্মাণ কাজে পাথর ব্যবহারের পদ্ধতি, কাগজ, কলম, লেখা ইত্যাদি।

পৃথিবী কিংবা মানুষের চূড়ান্ত আদি নিয়ে অন্বেষকদের কেউ কেউ মতানৈক্য প্রকাশ করেছেন-হয়ত, কিন্তু মানব সভ্যতার উন্নয়নে আরবদের ভূমিকা সর্বজন স্বীকৃত। খ্যাতনামা মনীষী জি.সি. ওয়েলস বলেছেন- "আরবদের ভিতর দিয়েই মানব জগত তার আলোক ও শক্তি সঞ্চয় করেছে। ল্যাটিন জাতির ভিতর দিয়ে নয়।" (চেপে রাখা ইতিহাস, গোলাম আহমদ মোর্তজা, পৃঃ ১৮)।

আমেরিকার প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমেটিক সাহিত্যের সাবেক অধ্যাপক এবং ডিপার্টমেন্টাল অব ওরিয়েন্টাল ল্যাঙ্গুয়েজের চেয়ারম্যান ফিলিপ কে. হিট্টি বলেছেন- "মধ্যযুগের কয়েক শতাব্দি জুড়ে পৃথিবীর শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রগতির প্রধান চিন্তা বাহক ছিল আরবী ভাষা। নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দি পর্যন্ত পৃথিবীতে দর্শন, ইতিহাস, ধর্ম, চিকিৎসা, জ্যোতি ও ভূ-বিদ্যা ইত্যাদি বেশি চর্চিত হয়েয়ে আরবী ভাষায়"।

তিনি আরও বলেছেন- "ল্যাটিনের পর বিশ্বব্যাপী আরবী বর্ণমালা বেশি চর্চিত হয়েছে। ফারসী, উর্দু, আফগানী, তুর্কী, বারবার, মালয় ইত্যাদি ভাষায় আরবী বর্ণমালা ছাড়াও পশ্চিম ইউরোপের ভাষায় আরবীর প্রভাব লক্ষণীয়।" (ফিলিপ কে. হিট্টি, হিস্টি অব দ্যা অ্যারব, ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ)

আরব হল সেমিটিয়দের ধাত্রী ভূমি। এখানেই অঙ্কুরিত পৃথিবীর প্রায় সকল আলোচিত ধর্ম-সভ্যতার বীজ। বর্তমান পৃথিবীর প্রধান তিন ধর্ম- ইহুদী, খ্রিষ্টান, ইসলামের মূল উৎপত্তি আরব থেকে। আজকে যে সভ্যতা-সাংস্কৃতিক সোপানগুলি পৃথিবী ব্যাপী দাঁড়িয়ে আছে তা মূলত এই তিন ধর্মের প্রস্ফুটন। অবশ্য এই তিনের ভেতর লুকিয়ে আছে মানুষের আদি আদম থেকে অনেক গুলি ধারা, চিন্তা, চৈতন্য, প্রচেষ্টা। এ ক্ষেত্রে আরবকে মানবের ধর্ম, সংস্কৃতি, সভ্যতার কোষ বলা যায়। ইসলামের আগমন এখানে সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে আদি, মধ্য, আধুনিক, অত্যাধুনিক, সর্বাধুনিক সকল তথ্য ও তত্ত্বের সমন্বয়ে।

ইহুদি, খ্রিষ্টান, ইসলাম ব্যতিত আরবে আরও অসংখ্য ঐশী ধর্মের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল, কালের বিবর্তনে অধিকাংশ হারিয়ে গেছে। যেগুলির অস্তিত্ব একেবারে লুপ্ত হয়নি সে গুলির পথচ্যুতি ঘটেছে, ইহুদি-খ্রিষ্টান ধর্মের মত তাদের মধ্য থেকেও ঐশীত্ব হারিয়ে গেছে। ফিলিপ কে. হিট্টি লিখেছেন- "শারীরিক, মানসিক, ভাষিক দিকে সেমেটিয় বৈশিষ্ট্য সমূহ আরব মুসলিম জনগোষ্ঠী ছাড়া অন্য কারও মধ্যে তেমন পাওয়া যায় না। ---সেমেটিয় ধর্মের যুক্তিপূর্ণ ও পরিমার্জিত রূপের সাথে মূল ইসলাম ধর্মের অনেক সাদৃশ্য।"(প্রাগুক্ত)

সেমেটিয়দের আদি-ধর্ম :

সেমেটিয়দের আদি হযরত নূহ (আঃ) এর ছেলে "সাম"। হযরত নূহ (আঃ) এর চার ছেলে ছিলেন- সাম, হাম, ইয়াফেস, কেনআন। মহাপ্লাবনের সময় সাম, হাম, ইয়াফেস ছিলেন পিতার নবুওয়তের প্রতি আনুগত্যশীল, অবাধ্যতার ফলে কেনআনের পতন ঘটে। নূহের সময় যে প্লাবন হয়েছিল তাতে পৃথিবীর সব কিছুই ধ্বংস হয়ে যায়-আনুগত্যশীল মানুষ ছাড়া বাকীরা সব। প্লাবন পরবর্তী সময়ে মানুষের পুনঃবিস্তার ঘটে নূহের বেঁচে যাওয়া তিন ছেলে থেকে। আরবের বিভিন্ন এলাকায় এবং পাশ্চাত্যের কিছু দেশে সামের বংশধরগণ বসতি স্থাপন করেন, ইতিহাসে "সেমেটিক" বা "সেমেটিয়" বলতে ওদেরকেই বুঝায়। হামের বংশধররা হিন্দুস্তানে বসতি এবং এখানের নগর-বন্দর গড়ে তোলেন। ইয়াফেসের বংশধররা তুরস্কের দিকে বসতি স্থাপন এবং সেখানের নগর-বন্দর প্রতিষ্ঠা করেন। নূহের এই তিন ছেলেই ঐশী জ্ঞানের বিশ্বাসী ছিলেন। কালের বিবর্তনে ওদের বংশধরদের অনেক বিভ্রান্ত হয়েছেন। সামের বংশধরদের ভেতর অসংখ্য নবী-রাসুলের আগমন ঘটেছে। সেমেটিক ধর্ম দর্শন বলতে হযরত সাম- "ইহুদী-খ্রিষ্টান-ইসলাম" এই তিন ধর্ম সেই ধারার উত্তরসূরী, তবে ইসলাম ছাড়া বাকী গুলি পরিবর্তন-পরিবর্ধনের ফলে সাদৃশ্যতা হারিয়ে নূতন এক রূপ নিয়েছে। পর্যবেক্ষকরা তাদের গবেষণালব্ধ আলোচনায় এ সত্যটাকে স্বীকার করেছেন। এই সাদৃশ্যের কথা পবিত্র কোরআনেও স্বীকার করা হয়েছে- "লা নুফার-রিকু বাইনা আহাদিম মীর রাসুলি" অর্থাৎ আমরা রাসুলদের মধ্যে কোন পার্থক্য সৃষ্টি করিনা। (সূরা বাকারা)।

মোট কথা সেমেটিক হলেন নূহের ছেলে সামের বংশধর। সাম ছিলেন পিতার ধর্মের বিশ্বাসী। পিতা হযরত নূহ (আঃ) ছিলেন একত্ববাদী, আল্লাহ কর্তৃক প্রেরীত রাসুল।

আরবী ভাষার প্রাচীনত্ব :

আরবী ভাষায় কবে থেকে সাহিত্য চর্চিত হচ্ছে? তা নিয়ে গবেষকদের মধ্যে দ্বিমত আছে। তবে আরবী ভাষা যে অনেক প্রাচীন সে ব্যাপারে প্রায় সকল একমত রয়েছেন।

ফিলিপ.কে.হিট্টি লিখেছেন; "সাহিত্যে সেমেটিয় ভাষার মধ্যে আরবী নূতন হলেও ভাষার রাঁধুনি ও শৈলিতে হিব্রুসহ অন্যান্য ভাষার তুলনায় তা সেমেটিকের বেশি নিকটতম।" (প্রাগুক্ত)।

আরবী ভাষাকে "আরবী" বলার কারণ?:

অভিধান থেকে "আরবী" শব্দের দু'টি অর্থ আমরা পেয়ে থাকি- (১) শান্ত, ভদ্র, সুশীল, সুবোধ, বাকনিপুণ ভাষা। (২) মরু সেমেটিয়দের ভাষা।

আমরা যদি এই দু' অর্থের সমন্বয় করে বলি যে, অন্যান্য সেমেটিক ভাষা গুলির মধ্যে মরু সেমেটিকদের ভাষা শান্ত, ভদ্র, সুশীল, সুবোধ, বাক নিপুণ বলে তার নাম আরবী- তবে নিশ্চয় যথার্থ হবে।

আরবী ভাষার প্রাচীনত্ব কতটুকু, পৃথিবীর আদি ভাষা কি?:

ভাষা বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর আদি ভাষা সম্পর্কে চূড়ান্ত ফয়সালা এখনও দিতে পারেননি। ইসলামী বিশ্বাস- পৃথিবীর আদি ভাষা আরবী-এটাই আদমের ভাষা। ভাষা বিজ্ঞানীদের চূড়ান্ত অন্বেষণে হয়ত তাই বেরিয়ে আসবে।

আরবী বর্ণ অক্ষরের জনক হিসেবে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন- নবী হযরত ইসামাইল (আঃ)। আবার অনেকে বলেন- ইসমাইল বংশের "আদনান" এর কথা। ঐতিহাসিক মসউদির মতে- "বনী মসিনের ছেলেরা আরবী বর্ণ অক্ষরের আবিস্কারক; তাদের নাম- আবজাদ, হুত্তি, হুওয়জ, কালিমন। ওদের নামানুসারে আরবী বর্ণ অক্ষরের নাম করণ করা হয়েছে।

ইবনে খালদুনের মতে- "পৃথিবীর প্রথম লেখা শুরু করেন দক্ষিণ আরবের লোকেরা।" (আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, পৃঃ ১০৪)।

ভাষা বিজ্ঞানী ডঃ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছেন- আরবী লিপি শামী লিপি থেকে এসেছে এবং গ্রীক ও লাতিন বর্ণমালাও ঐ শামীর অনুকরণে রচিত।" (ডঃ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর সম্বর্ধনা গ্রন্থ; আরবী বর্ণমালা)।

সিনাই উপদ্বীপ থেকে আবিস্কৃত বর্ণলিপিকে বলা হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীনতম বর্ণ লিপি। গবেষকদের মতে- খ্রিষ্টপূর্ব ১৮৫০ অব্দে সম্ভবত এই লিপি গুলি খোদাই করা হয়েছিল।"

আধুনিক গবেষকরা মনে করেন- "ফিনিশিয়রাই সর্ব প্রথম লেখার ক্ষেত্রে বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতি চালু করেন এবং তারা মিশরের সাংকেতিক চিত্রলেখা উপাদান থেকেই এই পদ্ধতির ভিত্তি গ্রহন করেছিলেন।" আমরা ইতিহাসে দেখতে পাই ফিনিশিয়দের মূল ধাত্রী ভূমি আরব।

ফিলিপ কে. হিট্টি লিখেছেন- প্রাচীন সেমেটিক ছিলেন একজন আরব, ইহুদী নয়। কবির মূল নাম "আয়য়োব" বা "আয়্যুব"। তার কবিতার পটভূমি বিচার করলেই বুঝা যায় তা যে উত্তর আরবীয়।"

তিনি আরও লিখেছেন ''প্রাচীন হিব্রু কবিতায় আরবীর প্রভাব পাওয়া যায়। মধ্য যুগের হিব্রু ব্যাকরণ আরবী ব্যাকরণ রীতি মেনে বিন্যস্ত করা হয়।'' (হিস্টি অব দ্যা আরব, ফিলিপ কে. হিট্টি)।

আরব জাতি :

ঐতিহাসিক প্রাচীন আরব জাতি গুলোকে প্রধানত তিন ভাগে বিভক্ত করে থাকেন-

(১) আরব-এ-বারেবা: প্রাচীন আরব জাতি, যারা ইসলাম পূর্ব যুগে কালের বিবর্তনে হারিয়ে গেছেন। যেমন: আদ, সামুদ, তামাস, জাদিস প্রমুখ।

(২) আরব-এ-আবেরা : ইয়ামন থেকে আগত বনু কাহতান গোত্রের লোকেরা। ওরা বারেবাদের পরে আরবের মূল বাসিন্দা হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

(৩) আরব-এ-মোস্তারেবা : বনু ইসমাইল। হযরত ইসমাইল (আঃ) আম্মা হযরত হাজেরার অনুমতিক্রমে 'জহুরুম' নামে একটি গোত্র মক্কায় বসতি স্থাপন করেন। এই গোত্রের ''মাদাদ বিন আমর জরহুমী'র মেয়েকে হযরত ইসমাঈল (আঃ) বিয়ে করেন। এই স্ত্রীর গর্ভ থেকে হযরত ইসমাঈল (আঃ) এর বারো ছেলে- নাবেত বা নিয়াবুত, কায়দার, আদবাইল, মোবশাম, মেশামা, দুইমা, মাইশা, হাদদ, তাইমা, ইয়াতুর, নাফিস, কাইদমানের জন্ম হয়। ইসমাইলের ছেলেরা মক্কায় থেকেই ইয়ামন, মিশর, সিরিয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন। পরবর্তীতে ওদের মধ্যে শুধু নাবেত ও কাইদারের বংশধররা ব্যাতিত বাকীরা মক্কা থেকে বেরিয়ে কালের স্রোতে ইতিহাস থেকে হারিয়ে যায়। হযরত মোহাম্মদ (সঃ) কাইদারের উত্তরসূরী। (সিরাতুন্নবী, প্রথম খন্ড, আল্লামা শিবলী নোমানী, আর রাহীকুল মাখতুম- আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারক পুরী)।

ইসলামের সূচনা লগ্নে আরববের মূল বাসিন্দা ছিলেন কাহতান ও ইসমাইল বংশের লোকেরা।

আরব কিংবা পৃথিবীর প্রাচীন ভূ-খন্ড নিয়ে ভূ-তাত্ত্বিকরা এখনও সন্দেহ মুক্ত হতে পারেননি। এখানে ইসলামের ঘোষণা সুস্পষ্ট।

''প্রথম পবিত্র ঘর যা মানুষের জন্য তৈরি করা হয়েছিল তা মক্কায়''। (সূরা আল-ইমরান, আয়াত-৯৬)

মক্কার প্রাচীন নাম- বাক্কা।

প্রাচীন আরবের ভৌগলিক অবস্থা :

খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে আরবে যে রাজনৈতিক বিভাজন হয় তার ভিত্তিতে ধ্রুপদীর লেখকেরা আরব ভূমিকে তিন ভাগে বিভক্ত করেন

(১) অ্যারাবিয়া-এ-ফেলিক্স; সুখী আরব ভূমি, যা ইয়ামনের মধ্যে কেন্দ্রীভূত ছিল। ''ইউমন'' অর্থ- সুখ, তা থেকেই ইয়ামন শব্দের উৎপত্তি। অবশ্য ইয়ামন শব্দের অন্য অর্থ- ''ডান হাত''। অনেকের মতে মক্কার ডান দিকে অবস্থিত বলে তার নাম ইয়ামন। ফেলিক্স ছিল সর্বদাই স্বাধীন, রোম-পারস্য কেউই তাদেরকে পরাধীনতার শৃংখলে আবদ্ধ করতে পারেনি।

(২) অ্যারাবিয়া-এ-পেট্রিয়া; সিনাই এবং নাবাতিয় রাজ্য নিয়ে এই অঞ্চল গড়ে উঠে। এই অঞ্চলের রাজধানীর নাম- পেট্রা। পেট্রিয়া ছিল রোমদের অধীনে।

(৩) অ্যারাবিয়া-এ-ডেজার্টা; আরব্য মরুভূমি। সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়া (বর্তমান ইরাক) মরুভূমি নিয়ে এই অঞ্চল। ডেজার্টা এক সময় আংশিক পার্থিয়ার নিয়ন্ত্রণে ছিল। (হিস্টি অব আরব, ফিলিপ কে. হিট্টি)।

গ্রীসের এরাতো স্থিনিস (মৃত ১৯৬ খ্রিষ্ট পূর্ব) থেকে শুরু করে রোমের প্লিনির মত ধ্রুপদীর লেখকেরা আরবকে এক সমৃদ্ধশালী এবং বিলাসী ভূ-খন্ড হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাদের মতে এটা ধুনা-গুগগুলের মত দুস্প্রাপ্য (তৎকালিন সময়ে) গন্ধদ্রব্য এবং অন্যান্য মশলার দেশ। আরবরা স্বাধীনতা ভোগ করে এবং ভালবাসে। পশ্চিমা লেখকদেরকে বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করে আরবদের স্বাধীন মনোভাব। ইউরোপিয়ান লেখকরা "সেই গিবনের" সময় থেকে আরবদের স্বাধীন মনোভাবের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

(এডওয়ার্ড গিবন : দি ডিক্লাইন অ্যান্ড ফল অফ দ্যা রোমান এম্পায়ার, সম্পাদনা- জে.বি, লন্ডন-১৮৯৮, পঞ্চম খন্ড, ৩১৯ পৃষ্ঠা)।

বর্তমান আরব বলতে আমরা বুঝি- পশ্চিমে লোহিত সাগর, পূর্বে পারস্য উপসাগর ও উমান সাগর, দক্ষিণে সিন্ধুর তীর, উত্তরে বিশাল বালু আর পাহাড়ের দেশ। বর্তমান আরব অনেক গুলি দেশে বিভক্ত, মূল আরব বলতে সৌদি আরবকে-ই বুঝায়।

হেরার কল্লোল :

জাহেলিয়াতের প্রতিপত্তি এক সময় সুধাংশুর মত প্রস্ফুটিত হয়ে উঠল গোটা বিশ্বব্যাপী। মানব সভ্যতা বিশ্বের প্রতিটি সমাজে ভেঙ্গে যাওয়া গ্লাসের মত চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে রুক্ষ পশুত্বে পুনরুজ্জীবিত হতে লাগল। চারিদিকের অন্ধকারাচ্ছন্নতা এতই গাঢ় হয়ে উঠল যে, পৃথিবীতে ঝিনুক পোকার মত যে সামান্য ঐশী আলো ছিল কিংবা যে সামান্য ঐশী ধর্মলক্ষী ছিলেন- তাদেরকে দৃষ্টিতে আসছিল না। এমনি জন্মান্ধতার এক বিকলাঙ্গ সময়ে আরবের মক্কা নগরীতে জন্ম হয় মানব সভ্যতার দিক নির্দেশক ঐশী দূত হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর। মানব সভ্যতার মর্মান্তিক বিপর্যয়ে মর্মাহত মোহাম্মদ (সঃ) যৌবনের শুরুতেই আশ্রয় নিলেন মক্কা থেকে তিন মাইল দূরবর্তী জবলে নূরের নিভৃত হেরা গুহায়, মানবতার মুক্তির স্বপ্নে ধ্যানলগ্ন মোহাম্মদ (সঃ)। দিন-মাস-বছর, এমনি করে চলে যায় অনেক গুলি দিন। চল্লিশ বছর বয়সে অকস্মাৎ একদিন চমকে উঠলেন তিনি- জিব্রাইলের "ইক্বরা-পড়" শব্দধ্বনিতে।

— ইকরা-পড়।

— আমি পড়তে জানিনা, কি পড়ব?

— পড় তোমার প্রভূর নামে যিনি তোমায় সৃষ্টি করেছেন একবিন্দু রক্ত থেকে।

দীর্ঘ ছয় শ' বছর পর স্বর্গীয় দূত জিব্রাঈলের কণ্ঠধ্বনিতে হেরা গুহায় হযরত মোহাম্মদ(সঃ)এর হৃদয়ে এবং জাহেলিয়াতে ঢেকে যাওয়া গোটা বিশ্বে নবকল্লোল সৃষ্টি হল। হযরত মোহাম্মদ(সঃ) পড়লেন। জবলে আবু কোবাইসে দাঁড়িয়ে আরও অনেককে পড়তে বললেন। পড়লেন আবু বকর,উমর,উসমান,আলী,খাদিজা,হামজা,বিলাল,খাব্বাব সহ আরও অনেকে। তাঁরা বেরিয়ে এলেন জাহিলিয়াতের অন্ধকুটির থেকে। আবু জেহেল,আবু লহাব প্রমুখরা পড়বেন না এবং অন্যদেরকেও পড়তে দেবেননা। তারা সংঘবদ্ধ হলেন ঐশী জ্ঞানপ্রদীপ নিভাতে। এটাযে মমের বাতি নয় তা তাদের বুঝে আসেনি। স্রষ্টার নির্দেশে এক গভীর রাতে বন্ধু আবু বকরকে সাথে নিয়ে সিরাজাম মুনিরা গিয়ে উপস্থিত হলেন খেজুর গাছের নগরী

মদিনায়। মদিনাবাসী হযরত মোহাম্মাদুর রাসুল (সঃ)কে স্বাগত জানিয়ে পার্থিব ও পারত্রিক প্রতিটি বিষয়ের নেতৃত্ব তাঁর হাতে ছেড়ে দিলেন। হযরত রাসুল (সঃ) এর নেতৃত্বে মদিনার মসনদে প্রতিষ্ঠিত হল খিলাফত ভিত্তিক রাষ্ট্র কাঠমো। ইসলামের রাজনৈতিক অবস্থান এখান থেকেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। এভাবে পর্যায়ক্রমে ব্যক্তি,পরিবার,সমাজ,অর্থ,যুদ্ধ,শিক্ষা,সংস্কৃতি ইত্যাদি মানব সম্পর্কিত প্রতিটি বিষয়ের নীতি – পদ্ধতি প্রণীত হয়ে ইসলাম ইহকাল এবং পরকালের সংমিশ্রনে পূর্ণাঙ্গ দ্বীন অর্থাৎ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে বিকশিত হতে থাকে। হযরত আদম (আঃ) থেকে মানব সভ্যতা ক্রমবিকাশের যে ধারা শুরু হয়েছিল তা দীর্ঘ দুর্গম পথ অতিক্রম করে হযরত মুহাম্মাদুর রাসুল(সঃ) এর মৃত্যুর মাত্র একাশি দিন পূর্বে (দশম হিজরীর নয়ই যিলহজ্ব শুক্রবার আসরের পর আরাফার জবলে রহমতে) ঐশী দূত জিব্রাঈলের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গতার সংবাদ পৌছল ঃ 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম।তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং দ্বীন হিসেবে ইসলামকে তোমাদের জন্য পছন্দ করলাম।' (সুরা মায়েদা, আয়াত-৩)। পরবর্তিতে কিছু দিন ওহীর ধারা অব্যাহত থাকলেও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর মতে বিধি-বিধান সম্পর্কিত আর কোন ওহী আসেনি।

এগার হিজরীর বার রবিউল আউয়াল হযরত নবী করিম (সঃ) তাঁর একান্ত বন্ধুর সাথে মিলিত হতে এ গ্রহ ছেড়ে চিরদিনের জন্য চলে যান। যাবার সময় রেখে যান মানব সভ্যতার চূড়ান্ত কষ্টি পাথর কোরআন হাদিস। কোরআন হল সরাসরি আল্লাহর কথা, যা হযরত জিব্রাঈল(আঃ)এর মাধ্যমে হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর কাছে পৌছানো হয়েছে। এটাকে বলা হয় ওহী-এ-মতলু। হাদিস হল হযরত মোহাম্মদ(সঃ) যা করেছেন- যা বলেছেন, তাই। হযরত নবী করিম(সঃ)কোন কথা বলতেন না আল্লাহর ইচ্ছে ছাড়া। তাই আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে হাদিসের ভাষা হযরত মোহাম্মদ(সঃ)কর্তৃক হলেও তার মর্মকথা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। হাদিসকে বলা হয় ওহী-এ-গয়ের মতলূ। কোরআন ও হাদিসের বাস্তব রূপ ছিলেন হযরত মোহাম্মদ(সঃ)। একজন সাহাবী হযরত আয়েশা (রাঃ)কে জিজ্ঞাস করেছিলেন নবী করিম (সঃ) এর জীবন-চরিত্র সম্পর্কে? উত্তরে আয়েশা বললেন; তুমি কি কোরআন পড়নি? নবী করিম (সঃ) ছিলেন কোরআনের বাস্তব রূপ। হযরত মোহাম্মদ (সঃ) তাঁর ঐশী জ্ঞান, প্রচেষ্টা, সংগ্রামের বিনিময় অসভ্য মানব গোষ্ঠির মধ্য থেকে এমন একটি গ্রুপ বের করে নিয়ে এলেন যারা ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন সত্যনিষ্ট আল্লাহভীরু এবং সামাজিক ক্ষেত্রে ছিলেন মানবতার উত্তম কর্ণধার। নবী করিম (সঃ) তাঁর সাহাবীদেরকে নিজে হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়ে নিজের মত কষ্টি পাথরে রূপান্তিত করে গেছেন। মহান আল্লাহ পাক হযরত সাহাবা-এ-কেরামদের প্রতি তাঁর সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। এই সাহাবাদের সহযোগিতায় হযরত মোহাম্মদ(সঃ) মদিনা কেন্দ্রিক এমন একটি সভ্য সজীব জ্যোতির্ময় সমাজের গোড়াপত্তন করেছিলেন যার দ্বিতীয় উদাহরণ এ পৃথিবেতে আজও অলক্ষ্যনীয়। সেই সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল সুস্পষ্ট তৌহিদি বিশ্বাস,মানুষের সম্মান-মর্যাদা-স্বাধীনতা-ভ্রাতৃত্ববোধ-ইনসাফ-সভ্যতা ইত্যাদি। প্রখ্যাত ফারসী সাহিত্যিক ল্যামার্টিন লিখেছেন ঃ 'স্বজ্ঞানে কিংবা অজ্ঞানে কোন মানুষ মোহাম্মদের ন্যায় এমন উচ্চতর পরিকল্পনা ও মিশন নির্বাচন করতে সক্ষম হননি।'

(LAMARTNE HISTORI DELATURQUIL, PARIS-1854, VOL.2. PP-276-277).

"ল্যামার্টিন" আরও লিখেছেন- "যে মূহুর্তে গোটা পৃথিবী অসংখ্য উপ-খোদার উপাসনায় ভাসমান এমনি মূহুর্তে একত্ববাদের ঘোষনা দেয়া এক বিরাট অলৌকিক ব্যাপার বৈ কি? মোহাম্মদের কণ্ঠে ধ্বনিত একত্ববাদের ঘোষণায় প্রাচীন প্রতিমা মন্দির গুলোতে দেখা দিল ধুলাবালির পদচারণা এবং এক তৃতীয়াংশ দুনিয়া জুড়ে দৃশ্যমান হল বিশ্বাসী উচ্ছ্বাস" (প্রাগুক্ত)।

আরবে মূর্তি পূজার ইতিবৃত্ত :

মূল আরবে মূর্তিপূজার প্রচলন কোন দিন ছিল না। "বনু খোজাআ" নামক একটি গোত্র বলপূর্বক বনু জুরহুম গোত্রকে মক্কার নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। এই গোত্রের মূল ধারা ইয়ামনের "বনু কাহতানি" বংশের সাথে। বনু খোজাআ গোত্রের সর্দার আমর ইবনে লোহাই একবার সিরিয়া ভ্রমণ কালে স্থানীয় মানুষদের মূর্তিপূজায় আকৃষ্ট হয়ে ফেরার পথে "হোবাল" নামী একটি মূর্তি এনে কা'বা ঘরে স্থাপন করে দেন। (মুখতাছারুস সীরাত-মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব, পৃঃ ১২)।

এই আমর ইবনে লোহাই পরবর্তীতে আরও বেশ কিছু মূর্তি এনে আরবের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে বিতরণ করেন। নূহের মূর্তি বলে কথিত-ওয়াদ্দা, সূয়া, ইয়াগুহ, ইয়াউক, নসর ইত্যাদি মূর্তিগুলি আমর ইবনে লোহাই জেদ্দা থেকে কুঁড়িয়ে আনেন, বিভিন্ন অঞ্চলে বিতরণ করেন। এভাবে আরবে মূর্তিপূজা প্রচলিত হয়ে পৌত্তলিকতা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এক সময় কা'বা ঘরের ভেতর প্রতিষ্ঠিত হয় তিন'শ ষাটটি মূর্তি। (আর রাহীকুল মাখতুম, আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারক পুরী)।

মক্কা বিজয়ের দিন হযরত মোহাম্মদ (সঃ) নিজ হাতে কা'বা ঘরের মূর্তিগুলি ধ্বংস করে দেন। মক্কা-মদিনাকে কেন্দ্র করে আবারও একত্ববাদের শ্লোগান চারিদিকে ধ্বনিত হতে থাকে।

মক্কার পথে

মক্কা আল-মোকাররামাঃ পৃথিবীর সর্বাধিক মর্যাদাশীল শহর। এই শহরের জন্ম শুধু ইবাদতের জন্য। পৃথিবীর প্রথম ইবাদত ঘর 'কাবা' এই শহরের সুদৃশ্য। এই শহর নবী ইব্রাহিম, ইসমাঈল, মোহাম্মদ (সঃ) এর স্মৃতিধন্য। যুগযুগান্তর থেকে এখানে মানুষ যায় হজ্জব্রতে, পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত থাকবে। এই শহরের 'গারে হেরায়' পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ঐশী গ্রন্থ আল-কোরআনের প্রথম অবতরণ শুরু হয় এবং হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) মহান আল্লাহ কর্তৃক নবী ও রাসুল হিসেবে স্বীকৃত হন। পৃথিবীর দেড়শ কোটি মুসলমানের কেবলা 'কাবা' এই শহরে। নবী ইসমাঈলের পদস্পর্শে সৃষ্ট জমজম কূপ, মা হাজেরার স্মৃতিবিজড়িত সাফা-মারওয়া পাহাড়, প্রিয় রাসুল (সাঃ) এবং মা খাদেজার ঘাম ঝরা জবলে নুর, ইব্রাহীম ও ইসমাঈলের আল্লাহ প্রেমের নিদর্শন মিনা এবং শয়তান

বিতাড়নের স্মৃতি বিজড়িত জামারাত, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) কর্তৃক মানব জাতিকে সর্বপ্রথম মুক্তির পথে-শান্তির পথে আহ্বানের স্মৃতিধন্য 'জবলে আবু কোবাইস' ইত্যাদি সবই এই মক্কা শহরে। মহান আল্লাহ যে শহরকে 'বালাদিল আমীন' বলে কসম করে মানুষের সৌন্দর্যের ঘোষণা করেছেন, তা এই মক্কা শহর। এখানেই আমার আদি-প্রাদি সবকিছু একাকার। আমি যাবো এই শহরে আমার আদি-প্রাদি তছনছ করে দেখতে। আমি দেখতে যাবো মানব সভ্যতার কোষাগার। আমি ছুঁয়ে দেখবো মানুষের আদি-প্রাদি সবকিছু। আমি যাবো রাসুল (সাঃ) এর মক্কায়-আমি যাবো আমার প্রভুর সামনে গোলামীর হাজিরা দিতে-হজ্বব্রতে।

অলস প্রস্তুতি আমার বেশ কিছু দিন থেকে, আগ্রহ বেশ পুরাতন। ভিসা-টিকেটের দায়িত্ব নিলেন বন্ধু সোহেল। বাকী ব্যবস্থাপনায় হাফেজ সৈয়দ কফিল। আমি নিশ্চিন্ত অলস আড্ডায় কিংবা বই-কাগজের ভেতর। ওরা দু'জনের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় শেষ হলো সকল প্রস্তুতি। যাত্রা হলো শুরু। সোহেলের ছোট ভাই রাশেদ, সম্পর্কিত ভাগিনা বদরুল, উর্দুভাষী আব্দুল আজিজকে নিয়ে আমরা মোট ছ'জন। 'ইয়ামনিয়া উড়ো জাহাজ' রাত আটটায় আমাদের নিয়ে হিথ্রোর আকাশে উড়লো। প্রথম গন্তব্য সানা, ইয়ামনের রাজধানী, প্রাচীন শহর। ইয়ামনের সাথে আমাদের আরব কিংবা সিলেটী জনগোষ্ঠির আত্মা ও রক্তের আত্মীয়তা। ছোট বেলা যতই পড়তাম হযরত শাহজালাল ইয়ামনীর কথা ততই আমার হৃদয় ছুঁতো ইয়ামন দেশ। হযরত শাহজালাল এবং তাঁর সাথীদের ইতিহাসে কিংবা প্রাচীন মক্কা নগরীতে আমাদের অনেকের শেকড় লুকায়িত, তাই ইয়ামন শব্দের তরঙ্গ আমায় নাড়া দেয়। আমরা যখন ইয়ামনের রাজধানী সানায় পৌছি তখন স্থানীয় সময় সকাল দশটা। অবতরণ-উড্ডয়ন কিংবা ট্রানজিট কালিন সময়ে যা দেখলাম তা সানা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার জন্য যথেষ্ট নয়, তবে কিছুটা অনুমেয়। বিশ্ব বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা সানা হয়ে হজ্বব্রতে গিয়েছিলেন ১৩২৫ খ্রিষ্টাব্দে। আমি যাচ্ছি ২০০২এ। মধ্যখানে ৬৭৭বছর অতিবাহিত, দীর্ঘ ব্যবধান। আমি একটু মিলাতে চাইলাম সেকালের সাথে একালের সানাকে। বিগত ৬৭৭বছরে পৃথিবী যে পরিমান উন্নত হয়েছে আমার কাছে মনে হয়েছে সানা সে পরিমান উন্নয়নের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে পারেনি। একটি মুসলিম দেশের অবনতি আমায় কিছুটা হলেও কষ্ট দিলো। ইয়ামন দিয়ে যাওয়া হজ্ব যাত্রীদের মিকাত 'এলামলাম পাহাড়'। মিকাত বলা হয় হজ্বের ইহরাম ও নিয়তের শেষ সীমা। আমরা সানা এয়ারপোর্ট থেকেই ইহরাম ও নিয়ত করে প্লেনে উঠি। প্লেন কর্তৃপক্ষ সকল হজ্ব যাত্রীকে একটি করে ছাতা দিলেন। "লাব্বায়কা আল্লাহুম্মা লাব্বায়ক..." তালবিয়া দিতে দিতে আমরা প্লেনে উঠলাম। প্লেন সানা থেকে যাত্রা শুরু করে ঘন্টা খানেকের ভেতর জেদ্দা হজ্ব টার্মিনালে পৌছে।

জেদ্দা হজ্ব টার্মিনালকে তেমন উন্নত বলা যাবেনা। বিশাল এলাকা নিয়ে বিভক্ত মিনার আকৃতির ছাদ অবশ্য সুদৃশ্য। জেদ্দা আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর হজ্ব টার্মিনাল থেকে পৃথক, কিছু দুরে, শোনা কথা- বেশ উন্নত। জেদ্দা নৌ-বন্দর হযরত উসমান (রাঃ) কর্তৃক নির্মিত, বেশ উন্নত। বিমান বন্দরের পাশেই জেদ্দায় মানুষের আদি মা হাওয়া (আঃ) ঘুমিয়ে আছেন। শহরটা বেশ পরিচ্ছন্ন।

সাবেক হজ্ব যাত্রীদের কাছ থেকে জেনেছিলাম জেদ্দা হজ্ব টার্মিনালের চেকিং দুর্গতির কথা, আল্লাহ পাকের মেহেরবাণীতে সে সব আমাদেরকে স্পর্শ করেনি শুধু চেকারের পাউন্ড

সম্পর্কিত জ্ঞানহীনতা ছাড়া। চেকিং অফিসার অল্প বয়সী একটি ছেলে, এখনও ভাল করে দাঁড়ি-গোঁফ গজায়নি। ইংরেজী না জানা কোন আয়েব নয়, তবে আন্তর্জাতিক কাষ্টম লাউঞ্জের অফিসারের কিছু ইংরেজী বলতে এবং পড়তে জানা উচিৎ। কাষ্টম অফিসারটি আমার থলি থেকে কিছু পাউন্ড বের করে জানতে চাইলো-

হাল-হাজা উর্দু ফুলুস?

আমি বললাম লা, হাজা বারতানিয়ান ফুলুস।

ছেলেটির বুঝ হলো না। সে একজন উর্ধ্বতন কর্তাকে ডেকে পাউন্ডগুলি তার হাতে দিয়ে কর্তব্য আদায়ের হাসি হেসে বিদায় নিল। কর্তা মহোদয় পাউন্ডগুলি একটু নেড়েচেড়ে জানতে চাইলেন: মা, মুশকিলা?

বিনিত কণ্ঠে আমি বললাম লা মুশকিলা, ইয়া আখী। হাজা বারতানিয়ান ফুলুস।

অফিসারটি বিনিতভাবে এই বলে বিদায় জানালো ইয়া হাজ্জী, মাফি-মাফি।

অফিসারটির কাছ থেকে বিদায় হয়ে শুরু হয় মালপত্র চেকিং। হাফিজ কফিল সাহেবের সাথে পান-সুপারী আছে, যা সৌদি আইনে নিষিদ্ধ। তিনি ব্যাগ খুলে পান-সুপারী পাঞ্জাবীর পকেটে নিয়ে কাস্টম অতিক্রম করেন। আমাদের সাথে একটা ইংরেজী পত্রিকা ছিলো, অফিসারটি তা তন্নতন্ন করে দেখে এবং আমাদের দিকে গাঢ়দৃষ্টিতে চায়। নিয়মতান্ত্রিক চেকিং শেষ। পয়ত্রিশ নম্বার মুয়াল্লিমের দায়িত্বে আমাদের মক্কার পথে যাত্রা শুরু। আকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন, খুব বৃষ্টি হচ্ছে। শরীরে কিছুটা শীত শীত করছে। দীর্ঘ সফরের ক্লান্তি এসে চোখে জমা হয়েছে, ঘুম ঘুম করছে। মক্কা শহরের প্রথম প্রান্তে রাওয়ালের উপর খোলা কোরআন আকৃতির বিশাল গেট 'মক্কা গেট'। মক্কা গেটের কাছাকাছি হতেই সমস্বরে আবার শুরু হলো "লাব্বায়ক" তালবিয়া। তালবিয়া পড়ে পড়ে আমরা মিসফালাহ মুয়াল্লিম অফিসে পৌছি। ইতিপূর্বে আমার জানা যে, মিসফালাহ মক্কার বাংগালী পাড়া। এখানে বাংলাদেশী সব কিছু পাওয়া যায়। গাড়ীতে বসে অসংখ্য বাংলাদেশী হাজীদের যাতায়াত দেখলাম। ভাল লাগলো। আমরা উঠবো সুবেকায়, খালেদ-বিন-ওয়ালেদ রোডের অফ, মসজিদুল হারামের ফাহাদ-বিন-আব্দুল আজিজ গেটের সামনের হোটেল "দার-এ-আব্বাসে"। মুয়াল্লিম অফিস থেকে পাসপোর্টের বিনিময়ে পরিচয় পত্র সংগ্রহের পর আছরের সাথে সাথে আমরা হোটেলে পৌছি।

মুয়াল্লিম পদ্ধতি :

মুয়াল্লিম শব্দের আভিধানিক অর্থ-শিক্ষক, উপদেশ দাতা। হজ্বের সময় "দায়িত্বশীল" অর্থে ব্যবহৃত হয়। সৌদি সরকার হাজী সাহেবদের সুবিধার্থে এবং নিজেদের ব্যবসায়িক সুবাদে এই পদ্ধতি চালু করেছেন। বিভিন্ন মুয়াল্লিমের দায়িত্বে হাজী সাহেবরা দেশ ভিত্তিক বিভক্ত থাকেন। হজ্ব যাত্রার পূর্বেই ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে মুয়াল্লিমের ধার্যিত অর্থ দিয়ে দিতে হয়। মুয়াল্লিমরা হাজী সাহেবদের মক্কা-মদীনা-মিনা-আরফা-মুজদালিফায় যাতায়াতের জন্য গাড়ীর ব্যবস্থা ছাড়াও মিনা, আরফা, মুজদালিফায় থাকার ব্যবস্থা করেন। পাসপোর্টের বিনিময় মুয়াল্লিম অফিস থেকে যে পরিচয় পত্র কিংবা হাতে বেল্ট বেঁধে দেওয়া হয় তাতে অনেকগুলি সুবিধার মধ্যে প্রধানত হাজীদের পাসপোর্টের সংরক্ষণ এবং হাজীদের হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কম, যে কোন জায়গায় হারিয়ে গেলে শুধু হাতের বেল্ট দেখালেই হয়। মুয়াল্লিম

অফিসের বেশির ভাগ কর্মচারী স্বেচ্ছাসেবক-ছাত্র-অল্পবয়সী। ওদের ব্যবস্থাপনায় যে ক্রুটি পরিলক্ষিত হয় তা আমার কাছে যৎসামান্য মনে হলেও আমার বন্ধু লন্ডনের মুফতি সদর উদ্দিনের কাছে ছিল তা ক্ষুব্ধতার কারণ। তাঁর সরল-সহজ-দৃঢ় কথা- ''আপনি যত যুক্তিই দেন না কেন মবনু ভাই, আমি বলবো এ জন্য সৌদি সরকার সম্পূর্ণ দায়ী। বর্তমান রাজতান্ত্রিক সরকার যতটুকু মুসলমানদের বন্ধু তার তিন গুন বেশি ইহুদী, খ্রিষ্টানদের। ইংল্যান্ডের চিড়িয়াখানা রক্ষার্থে তারা মিলিয়ন-বিলিয়ন পাউন্ড খরচ করতে পারে, জুয়া আর নারীবাজীতে তারা অকাতরে বিলিয়ে দেয় অথচ দরিদ্র মুসলিম দেশগুলির মানুষদের সাহায্যার্থে এগিয়ে যায় না। ওরা মুসলিম উম্মাহর শত্রু, বিশ্বাস করুন।'' মুফতি সাহেবের মতের সাথে আমি অভিন্নতার মাঝেও শুধু হজ্ব বিষয়ে ভিন্ন মত প্রকাশ করি। অবশ্য তা সত্য সৌদি সরকার চাইলে ব্যবস্থাপনায় আরও উন্নতি আনতে পারতেন। তা ছাড়া আমি লক্ষ্য করেছি মুয়াল্লিম অফিসের কর্মচারীদের এবং আমাদের মত সাধারণ হজ্ব যাত্রীদের শিক্ষার অভাবটা দুঃখজনক। অথচ ইসলামের মূল ভিত্তিটাই শিক্ষা। ইকরা-পড় দিয়ে কোরআনের শুরু। হযরত নবী করিম(সঃ) বলেছেন- প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য শিক্ষাটা ফরজ। পবিত্র কোরআনে বার বার উচ্চারিত হয়েছে- যারা জানে আর যারা জানেনা? তোমরা কি মনে করো উভয় সমান?

কা'বা ও মসজিদুল হারাম :

কা'বা পৃথিবীর আদি ঘর, তা পবিত্র কোরআন কর্তৃক স্বীকৃত। নুহের মহা প্লাবনে তা বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহর নির্দেশে হযরত ইব্রাহিম ও ইসমাঈল (আঃ) কর্তৃক পূনঃনির্মিত। হযরত নবী করিম (সাঃ) এর জন্মের মাত্র ৫০ দিন পূর্বে ইয়েমেনের রাজপ্রতিনিধি আবরাহা এই কা'বা ভাংতে এসেছিলো বিশাল হাতির বহর নিয়ে। মুজদালিফা ও মিনার মধ্যবর্তী "ওয়াদিয়ে মুহাস্‌সা" নামক স্থানে আসার সাথে সাথে ঝাঁকে ঝাঁকে আবাবিল পাখি বৃষ্টির মতো ওদের উপর ছোট ছোট পাথর নিক্ষেপ করে। আবরাহার বাহিনী এখানেই ধ্বংস হয়ে যায়। হযরত মোহাম্মদ-এর নবুওয়্যত প্রাপ্তির কিছু দিন পূর্বে ৬০৫ খ্রিষ্টাব্দে কা'বার দেয়াল ভেঙ্গে পুনঃনির্মাণ করা হয়। এ সময় কালো পাথর অর্থাৎ হজরে আসওয়াদ স্থাপন নিয়ে মক্কার গোত্রতান্ত্রিক সর্দারদের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি হলে ফায়সালার দায়িত্ব এসে যায় যুবক মোহাম্মদের (সাঃ) কাছে। শেষ পর্যন্ত তাঁর নেতৃত্বে কা'বার দেয়ালে হজরে আসওয়াদ স্থাপিত হয়। আমর ইবনে লুহাই কর্তৃক কা'বায় যে মূর্তি স্থাপিত হয়েছিল, তা মক্কা বিজয়ের দিন হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) নিজ হাতে অপসারণ করেন। ইসলামী যুগে হযরত ওমর (রাঃ)-এর খিলাফতের সময় কা'বার প্রথম সম্প্রসারণ করা হয়। উমাইয়া খলিফা ওয়ালিদ ইবনে আব্দুল মালেক মসজিদের সীমানার সাথে এক খন্ড জমি সংযোগ করে কা'বাকে নূতন ভাবে ঢেলে সাজান, সিরিয়া এবং মিশর থেকে মার্বেল পাথর এনে মোজাইক করা খিলানের সংযোজন করেন। আব্বাসী খলিফা আবু জাফর আল-মনসুর মসজিদকে আরও সম্প্রসারণ এবং ঘুর্ণায়মান স্তম্ভ শ্রেণী নির্মাণ করেন। ৭৭৬ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা আল-মাহদীর নির্দেশে কা'বাকে মাসআর সাথে সংযোগ ঘটালে তার সীমা বৃদ্ধিপায় ১,২০,০০০ বর্গমিটার। আব্বাসী খলিফা মুতাজিদ বিল্লাহ ও খলিফা মুকতাদির বিল্লাহ কর্তৃক মসজিদের সীমানা

যতটুক বর্ধিত হয়েছিল ৯১৮ খ্রিষ্টাব্দের দিকে তা সাউদ পরিবারের ক্ষমতা গ্রহনের পূর্ব পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকে।

১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে বাদশা সাউদ কর্তৃক মক্কার মসজিদুল হারাম সম্প্রসারণের নির্দেশ দিলে কয়েকটি স্তরে কাজ শুরু হয়। মাসআর নিকটবর্তী এবং সাফা-মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে যে সব বাণিজ্যিক ও আবাসিক ভবন সায়ীর পথে বাধা সৃষ্টি করত সেগুলি অপসারণ করে সাফা-মারওয়ার মধ্যদিয়ে আল-কোবা, আল সামিয়া কোয়ার্টারের দিকে একটি সড়ক নির্মাণ করা হয়। মাসআর ভবনকে দু-স্তরে নির্মাণ করা হয়। প্রথম স্তরের উচ্চতা ২২ মিটার, দ্বিতীয় স্ত রের উচ্চতা ৯ মিটার। মাসআর ভেতরের দৈর্ঘ্যতা ৩৯৪.৫ মিটার এবং প্রস্থে ২০ মিটার। সাফা-মারওয়ার মধ্যভাগে প্রাচীর নির্মাণ করে গমনাগমনের রাস্তাকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়। মাসআর পূর্ব দিক বরাবর ষোলটি এবং উপরি ভাগের জন্য দু'টি প্রবেশ দ্বার স্থাপন করা হয়। মসজিদুল হারামের বাবুস সাফা এবং বাবুস সালামের দিকে একটি করে সিঁড়ি স্থাপন করা হয়। তলদেশে সাড়ে তিন মিটার উচ্চ একটি জাল তৈরী করা হয় এবং প্রবাহমান পানি নিষ্কাশনের জন্য একটি ঘূর্ণায়মান গেট সংযোগ করা হয়। ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দের দিকে মসজিদের দক্ষিণ অংশের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে দেয়ালে মার্বেল পাথর এবং খাম ও ছাদে নক্শী কাটা পাথর লাগানো হয়। বৃষ্টির পানি অপসারণের জন্য স্যুয়ারেজ লাইন স্থাপন করা হয়। হজ্ব যাত্রীদের সুবিধার্থে সাফা পাহাড়ের দিকে আরেকটি রাস্তা স্থাপিত হয়। ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে দক্ষিণ ও পশ্চিম থামওয়ালা বারান্দার দ্বিতীয় অংশ এবং তার পাশে মাটির নীচে ভিত্তি ভূমি তৈরী করা হয়। আল-উমরাহ ফটক থেকে আস-সালাম ফটকের সম্প্রসারিত ভূমিতে উত্তরের থামওয়ালা বারান্দা নির্মিত হয়। মাসআর ব্যতিত মসজিদের অবকাঠামোর তলদেশের সমগ্র ভিত্তি নির্মিত হয়। মসজিদ সম্প্রসারণের পর সমগ্র মাসআর এলাকা ৮,০০০ বর্গ মিটার উপরিভাগের তলদেশে ৮,০০০ বর্গ মিটার পরিসীমায় পৌছে। মসজিদের মূল ভবনের চার পাশে আরো পাঁচশ বর্গমিটার এবং সর্বমোট ৬৪টি দরজা নির্মিত হয়। সম্প্রসারণ প্রকল্প বাস্তবায়নের পর মসজিদের বাইরের এলাকা ১.৯৩,০০০ বর্গমিটারে পৌছে যা পূর্বে ছিলো ২৯,১২৭ বর্গমিটার। ১৩,১০৪ বর্গমিটার বৃদ্ধির ফলে মসজিদ চার লাখ নামাজীর ধারণ ক্ষমতা অর্জন করে। পবিত্র কা'বার তাওয়াফ এলাকা বিস্তৃতি এবং মাকামে ইব্রাহীমের নবরূপায়ন করা হয়।

বাদশা ফাহদ বিন আব্দুল আজিজের সময় বিদ্যমান মসজিদ ভবনের পশ্চিম পাশে অবস্থিত ছোট বাজার এলাকার 'আল-ডিমরা' ফটক এবং 'আল-মালেক' ফটকের মাঝে অতিরিক্ত নূতন অংশ অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এ অবকাঠামো সমতল স্তরে ৭৬,০০০ বর্গমিটার স্থান নীচু স্তর, প্রথম স্তর, ভিত্তি স্তর- এ তিন স্তরে বিভক্ত করা হয়েছে। এতে মসজিদে অতিরিক্ত প্রায় ১,৯০,০০০ নামাযীর স্থান সংকুলান হয়। সম্প্রসারিত প্রকল্পে ছোট বাজার থেকে ৫৯,০০০ বর্গমিটার অন্তর্ভূক্ত করার ফলে অতিরিক্ত ১৩০ লাখ নামাযীর স্থান সংকুলান হয়ে থাকে। এ সম্প্রসারণের ফলে মসজিদের সীমা চার দিকে সম্প্রসারিত আঙ্গিনাসহ ৩,২৮,০০০ বর্গমিটার হয়। এতে প্রায় ৭৩,০০০ নামাযী এবং হজ্ব ও রমজানের সর্বাধিক ভিড়ে এক মিলিয়ন নামাযীর স্থান সংকুলান হয়। ১৪০৯ হিজরীর ২ সফর বাদশা ফাহদ বিন আব্দুল আজিজ কর্তৃক মসজিদুল হারামের সম্প্রসারণের ভিত্তি প্রস্তর করার পর যে সব কাজ হয়েছে তার পর মসজিদের সীমানা গিয়ে দাঁড়ালো ২০৮,০০০ বর্গমিটার, ছাদে নামাজের

এলাকা ৬১,০০০ বর্গমিটার, পরিবেষ্টিত এলাকা ৫৯,০০০ বর্গমিটার, সর্বমোট এলাকা ৩২৮,০০০ বর্গমিটার, ৮৯ মিটার উচুঁ ৯টি মিনার, ১১টি সিঁড়ি, ৭টি চলন্ত সিঁড়ি, ৪০,০০০ টন ক্ষমতাসম্পন্ন শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ইত্যাদি।

[The Two Holy Mosques, Published by kingdom of Saudi Arabia Ministy of information]

কা'বা আমার হৃদয় স্পন্দনে :

মসজিদুল হারামের প্রায় সাতটি প্রধান প্রবেশদ্বার এবং বিশটি অতিরিক্ত প্রবেশদ্বার রয়েছে। আমাদের হোটেল "দার-এ-আব্বাস" বাবে মালিক ফাহদের সামনে। দীর্ঘ ভ্রমনে ক্লান্ত আমার শরীর, বিশ্রামে যাব কি না ভাবছি, হৃদয়ে আমার কা'বা, আমি ঝুলে আছি কা'বার কালো গিলাফে। উমরার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গেলাম আমি, হাফেজ কফিল, আব্দুল আজিজ এবং মক্কা প্রবাসী আব্দুর রহিম। বাবে উমরা দিয়ে আমরা প্রবেশ করলাম কা'বাভিমুখে। যতই এগোতে থাকি আমি হারিয়ে যাই স্মৃতির সিন্দুক খুলে বাসর রাত্রিতে- প্রথম নারী স্পর্শের আকাংখায় অপেক্ষিত আমি। বিয়ে বাড়ীর সকল আনুষ্ঠানিকতার অসহ্য সময় শেষে নানির অভ্যর্থনায় বাসর ঘরে যাত্রা শুরু, সুখ-দুঃখের আগামীর পথে একাকিত্বের দীর্ঘ অতীত পিছনে ফেলে। আনন্দ ভয় দু'টিই আমায় সম্পূর্ণ গ্রাস করে নিচ্ছে, অনুভূতিহীন রোবট মানুষের মতো আমি যাচ্ছি নানির পিছু পিছু, বাড়ীর ছোট বড় সবাই, আশপাশের প্রকৃতি চেয়ে আছে আমার দিকে। নানী আমায় বাসর ঘর পর্যন্ত পৌছিয়ে বিদায় নিলেন। অতি কাংখিত কিছুর স্পর্শে মানুষের অনুভূতি যে পর্যায়ে পৌছে আমার অবস্থা তাই। দীর্ঘ দিন পর হৃদয়ে সেই অনুভূতি, সেই স্পন্দন নিয়ে আমিও মিশে গেলাম লক্ষ লক্ষ মানুষের ঢলে। কা'বাভিমুখে। কা'বার প্রথম দর্শনে প্রার্থনা হয় কবুল, আমি এই সুবর্ণ সুযোগে কি চাইবো মহান প্রভুর কাছে? কোন বিষয়টাকে আমি এই শুভক্ষণে প্রাধান্য দেব? না, আমি কিছু চাইতে আসিনি আজ। আমি এসেছি শেকড়ের কাছাকাছি বাবা ইব্রাহিমের পদচিহ্ন ছুঁয়ে দেখতে, আদি বাবা আদমের স্মৃতি বিজড়িত কালো পাথরে চুমু দিতে, মা হাজেরার কষ্টানুভূতির স্মরণে সাফা-মারওয়ায় দৌড়তে, মা খাদিজার শরীরের ঘাম লাগা জবলে নুরের পাথর গুলিতে গা লাগাতে, প্রথম ওহীর স্মৃতি বিজড়িত গারে হেরা দেখতে, মোহাম্মদী নীতিতে "লাব্বায়কা আল্লাহুম্মা" বলে মহান প্রভুর সামনে গোলামের উপস্থিতি জানাতে। আমি'তো অনেক কিছুই বলতে চাই, অনেক কথার পাহাড় জমে আছে হৃদয়ে। আমি মুখ খুলে কিছুই বলতে যাব না। বলার প্রয়োজন কি? তিনি তো অন্তর্যামী, অন্তরস্বামী। প্রতিদিন আমার কানে যে ধ্বনিত হয় পৃথিবীর শোষিত, বঞ্চিত মজলুম মানুষের আর্তচিৎকার, তা কি তিনি শুনছেন না? আমরা যে প্রতিদিন দেখি পৃথিবীর মুসলিম জনপদগুলিতে রক্তের স্রোত, লাশের স্তুপ, মানুষের গলিত হাড়-মাংস, নির্যাতীত ধর্ষিত মা-বোনদের লজ্জিত চেহারা, তা কি আমাদের প্রভু দেখছেন না? আমি গোলাম হয়ে মুনিবের সামনে কিভাবে দাঁড়াবো ফরিয়াদ নিয়ে? না, তা হতে পারে না, আমি তাঁকে কিছুই বলতে আসিনি। এসেছি শুধু গোলাম হিসেবে প্রভুর নির্দেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশার্থে। আমি এসব ভাবছি, আর সামনের দিকে এগিয়ে যাচিছ। সামনে কা'বা। আমার চোখ, মন, অস্তিত্ব সবই শরীর ছেড়ে

দ্রুত গিয়ে ধাক্কা খেল কা'বায় ঝুলানো কালো গিলাফে। হৃদয়ের সকল কাকুতি নিয়ে ফুঁস করে বেরিয়ে গেলো মুখ দিয়ে- হে প্রভু! ক্ষমা করো, রক্ষা করো তোমার গোলামদেরকে। আর অপমানিত করো না শত্রুর সামনে তোমার প্রিয় নবী (সাঃ)-এর উম্মতদেরকে।

একথাগুলি বলতে বলতে আমি পা পা করে মিশে গেলাম কা'বাকে মধ্যে রেখে ঘুর্ণিয়মান মানব স্রোতে। বায়তুল্লাহের তাওয়াফ-সাফা-মারওয়ায় সায়ী ইত্যাদি সমাপ্ত করে জম জম কূপের কাছে যাই, ইচ্ছে মত জমজমের পানি পান করে দীর্ঘ ক্লান্তি ঝেড়ে শিশু ইসমাঈলের কষ্টের কথা ভাবি।

হযরত আলী-আমি এবং কা'বা :

যুবকদের মাঝে প্রথম মুসলমান, হযরত নবী করিম (সঃ)এর প্রিয় চাচা মক্কার প্রতাপশালী নেতা আবু তালিবের ছেলে, রাসুল (সঃ) এর প্রিয় কন্যা স্যাইয়েদুনা ফাতেমাতুজ জাহরা (রাঃ)এর স্বামী, আসাদুল্লাহিল গালিব হযরত আলী (রাঃ)র সাথে দ্বীনি সম্পর্কের পরও আমার একটা রক্তের সম্পর্ক রয়েছে। কা'বা ঘরের সামনে দাঁড়াতেই আমার গোটা অস্তিত্ব কেঁপে উঠে- এই ঘরের ভেতরেইতো হযরত আলী (রঃ)এর জন্ম। সেই সময়ে বছরে একদিন মহিলারা কা'বার ভেতরে যাওয়ার সুযোগ পেতেন। আবু তালিবের স্ত্রী এমনি একদিন অন্যান্য মহিলাদের সাথে কা'বার দেয়াল টপকে ভেতরে গেলেন। সেই সময় আজকের মতো সিঁড়ি কিংবা দরজা ছিলো না। ভেতরে যাওয়ার সাথে সাথেই আবু তালেবের স্ত্রীর পেটে প্রচন্ড ব্যথা শুরু হয়। অনেকে ভাবলেন হয়তো দেয়াল টপকানোর ক্লান্তি, কিন্তু দেখা গেলো এটা প্রসব ব্যথা। দেয়াল টপকিয়ে আসার সুযোগ নেই, সেখানেই তিনি প্রসব করলেন একটি ছেলে, যার নাম রাখা হলো আলী।

তাওয়াফে বায়তুল্লাহ :

বায়তুল্লাহ- অর্থাৎ আল্লাহর ঘর- কা'বা, পবিত্র কোরআনের ভাষ্যনুসারে এটা পৃথিবীর প্রথম পবিত্র ঘর।

প্রথম পবিত্র ঘর যা মানুষের জন্য তৈরি করা হয়েছিল তা বাক্কায় (আল-ইমরান-৯৬)

মক্কার প্রাচীন নাম বাক্কা, যা পৃথিবীর মধ্যখানে অবস্থিত। কা'বার চারিদিক বেষ্টিত মসজিদুল হারাম। এই মসজিদে এক রাকাত নামাজে এক লক্ষ রাকাতের সওয়াব। গোটা বিশ্ব মুসলিমের কেবলা- কা'বা। হযরত নূহ (আঃ) এর মহাপ্লাবনে কা'বার দেয়াল বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল, যা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও ইসমাঈল (আঃ) পুনঃনির্মাণ করেন। কা'বার উঁচু প্রাচীর নির্মাণের সুবিধার্থে সেই সময় আল্লাহর নির্দেশে একটি পাথর এসেছিল, যা প্রয়োজনে উঁচু-নীচু যাওয়া আসা করতো। পাথরটি বর্তমানে কা'বার পূর্বপাশে একটি সোনালী পিতলের জালি ও গ্লাসের ফ্রেমের ভিতর সংরক্ষিত, যার গায়ে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর পায়ের ছাপ গর্তের মতো বিদ্যমান। কা'বা গৃহের দক্ষিণ দেয়ালের কোণে গাঁথা হাজরে আসওয়াদ-কালো পাথর। হযরত আদম (আঃ) এর সাথে এই পাথর বেহেশত থেকে এসেছিল। এই পাথর এক সময় কালো ছিল না, মানুষের পাপ চুষে তা কালো হয়েছে, এভাবেই আমাদের ধারণা। হযরত নূহের মহাপ্লাবনের পর থেকে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর

কা'বা পুনঃ নির্মাণের সময় পর্যন্ত এই পাথর কা'বার নিকটস্থ "আবু কোবাইস" নামক পাহাড়ে সংরক্ষিত ছিল। হযরত ইসমাইল (আঃ) তা এনে কা'বার দেয়ালে লাগিয়ে ছিলেন। হযরত নবী করিম (সাঃ) এই পাথরে চুমু দিতেন। হযরত ওমর (রাঃ) হাজরে আসওয়াদ চুম্বনকালে বলেছিলেন- "হে পাথর, তুমি একটা পাথর ছাড়া আমার কাছে অন্য কোন মর্যাদা রাখনা, আমি তোমাকে চুম্বন করছি যেহেতু আমার প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) চুম্বন করেছেন" । (বোখারী শরিফ)

তাওয়াফের সময় হাজরে আসওয়াদের চুম্বনকে কেন্দ্র করে অতিরিক্ত ভিড়-চাপাচাপি-ধাক্কাধাক্কি লক্ষ্য করা যায়। এখানে একটি সুন্নত পালন করতে গিয়ে অসংখ্য ফরজচ্যুতি ঘটে। নারী-পুরুষের ধাক্কাধাক্কি অনেকটা লজ্জাকর। নারী-পুরুষের এক সাথে কা'বার তাওয়াফ যদিও শরীয়ত সম্মত কিন্তু ইচ্ছেকৃত কিংবা অপ্রয়োজনীয় ধাক্কাধাক্কি, শরীরে শরীর লাগিয়ে চাপাচাপি কোন অবস্থায়ই বৈধ হবে না। এতে অবশ্যই পর্দা ভঙ্গ হয়। তাছাড়া ধাক্কাধাক্কিতে একজন অন্যজনকে কষ্ট দিয়ে থাকেন, তা সওয়াব থেকে বেশি পাপের কারণ হয়ে যায়। অনেকের ধারণা হাজরে আসওয়াদে চুম্বন দিতে পারা হজ্ব কবুলের লক্ষণ, না দিতে পারা বদ কিসমতি। এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। হজ্বের সাথে হাজরে আসওয়াদে চুম্বনের কোন সম্পর্ক নেই। বরং ধাক্কাধাক্কি করে চুম্বন দেওয়ায় মানুষের যে কষ্ট হয় এবং নারীদের যে পর্দা নষ্ট হয়, তা পাপ।

তাওয়াফ শেষে মাকামে ইব্রাহীমে দু'রাকাত নামাজ পড়তে গিয়ে অনেকে ঝামেলা সৃষ্টি করেন, তা অনুচিৎ। মাকামে ইব্রাহীমে নামাজ পড়া সুন্নত, তবে মসজিদুল হারামের যে কোন অংশে আদায় করলে তা হয়ে যায়। তাওয়াফের অত্যন্ত ভিড়ের সময় ও অনেকে মরিয়া হয়ে উঠেন মাকামে ইব্রাহীমে নামাজের জন্য, যা তাওয়াফকারীদের কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অথচ ফরজ নামাজ ছাড়া বাকী সকল ইবাদত থেকে শ্রেষ্ঠ ইবাদত তাওয়াফ। যারা মাকামে ইব্রাহীমে দু'রাকাত সুন্নত নামাজের জন্য শ্রেষ্ঠ ইবাদত তাওয়াফকারীদের কষ্ট দেন, তাঁরা নিশ্চয় গুনাহের কাজ করেন। যেহেতু মসজিদুল হারামের যে কোন অংশে নামাজ পড়লে সুন্নত আদায় হয়ে যায়। তাই হাজী সাহেবদের উচিৎ তাওয়াফ শেষে ভিড়ের সময় মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়া। মোট কথা যেকোন কাজে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে, আমার দ্বারা যাতে অন্যের কষ্ট না হয়। শুধু হজ্বে নয়, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তা লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। আমি বায়তুল্লাহের তাওয়াফ, সাফা-মারওয়ায় সায়ী, জমজমে পানি পান শেষে হাজরে আসওয়াদে চুমু না দিয়েই ফিরে আসি ঘরে, হৃদয়ে কিছুটা আকাংখা রেখে।

হাজরে আসওয়াদে চুম্বন :

জীবনের প্রথম হজ্ব, অনুভূতি-ই ভিন্ন। হাজরে আসওয়াদে চুম্বনের আকাংখা থাকলেও ভিড় ঠেলে এগুলাম না। ফিরে আসলাম হোটেল কক্ষে। রাত আড়াইটার দিকে আবার গেলাম কা'বার কাছাকাছি। তেমন ভিড় নাই দেখে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করে এগিয়ে গেলাম। কা'বার দেয়াল ঘেষে লাইনে দাঁড়ালাম। পনেরো-বিশ মিনিটের মধ্যে হাজরে আসওয়াদের কাছাকাছি গিয়ে চুম্বন দিলাম। হাজরে আসওয়াদ বেশ কিছু খন্ডের সমন্বয়। হাজরে আসওয়াদের মর্যাদা আমার কাছে এতটুকু, যতটুকু ছিল হযরত ওমর (রাঃ)-র কাছে। হাজরে আসওয়াদ ও কা'বার দরজার মধ্যবর্তী অংশকে "মুলতাযম" বলা হয়। মুলতাযমে

বুক, হাত,মুখমন্ডল লাগিয়ে দোয়া করতে গিয়ে যে ভিড় হয় তা তাওয়াফে বাঁধা সৃষ্টি করে। তাওয়াফে বাঁধা সৃষ্টি, নামাজে বাঁধা সৃষ্টির মতোই শক্ত পাপ। আল্লাহর প্রেমে আবেগপ্রবণ হওয়া খুব ভাল, কিন্তু নিজের আবেগপ্রবণতা আল্লাহর অন্য কোন বান্দার জন্য যাতে কষ্টদায়ক না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। আবেগের সাথে বুদ্ধি না থাকলে তা হয়ে যায় পাগলামী ও ক্ষতির কারণ।

মসজিদুল হারামে মহিলা-পুরুষ এক কাতারে :

পর্দা সর্বাবস্থায় প্রতিটি মহিলার ওপর ফরজ- ফরজে আইন। মসজিদুল হারামসহ যেকোন মসজিদের জামাতে পর্দার সাথে মহিলাদের অংশ গ্রহণ শরিয়ত সম্মত। তবে নারী-পুরুষ এক কাতারে দাঁড়ানো বৈধ নয়। আমাদের অনেকের ধারণা মসজিদুল হারামে হয়তো নারী-পুরুষ এক কাতারে দাঁড়ানো জায়েজ আছে। ধারণাটি সম্পূর্ণ ভুল। তাওয়াফ ছাড়া কোথাও নারী-পুরুষ এক সাথে বসে কিংবা দাঁড়িয়ে ইবাদত করা হারাম। নামাজের সময় স্বামী-স্ত্রীও যদি এক কাতারে দাঁড়ান, তবু নামাজ নষ্ট হয়ে যাবে। মসজিদুল হারামে নামাজের জামাতে কিংবা এমনি বায়তুল্লাহের সামনে বসতে খুব অসুবিধা হয়েছে যখনই নারীরা এসে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছেন কিংবা বসেছেন। আমি ব্যক্তিগত ভাবে অনেককে বারণ করেছি, অনেক সময় উঠে অন্যত্র চলে গেছি। মসজিদের নিয়ম-শৃংখলা রক্ষাকারী পুলিশ বার বার এসে বলছেন- "ইয়া হাজ্বী লা তাকু'ম, হাজা হারাম, অথবা ইয়া হাজ্বী, লা তাকউস, হাজা হারাম।" "হে হাজী এখানে দাঁড়াইও না, এটা হারাম অথবা হে হাজী এখানে বসো না, এটা হারাম।" এত বলার পরও একদল নারী পুরুষের গা ঘেঁষে নামাজে দাঁড়িয়ে যান কিংবা ইবাদতের উদ্দেশ্যে বসে পড়েন। অথচ মসজিদে নারীদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে। নারীদের উচিত তাদের জন্য সংরক্ষিত স্থানে নামাজ আদায় করা। নতুবা যেমন নিজের নামাজ নষ্ট হবে, তেমনি অন্যদেরও। হজ্বে যাওয়ার পূর্বে প্রত্যেক হজ্ব যাত্রীর উচিৎ হজ্ব সম্পর্কিত মাসআলা জেনে নেওয়া। এত টাকা খরচ, এত সময় নষ্ট, এত কষ্ট করে যদি সামান্য অসচেতনতার কারণে সব কিছু বিফলে যায় তবে কি লাভ হলো? অনেকের ধারণা হজ্বের সময় শরীয়তের পর্দা আইন রহিত হয়ে যায়। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। বরং হজ্বের সময় বেশি করে পরহেজগারী-তাকওয়াহ অবলম্বন করা প্রয়োজন। অনেক নারীকে দেখা যায় সুযোগ পেলেই অতিরিক্ত সাজ সজ্জায় মেতে উঠেন, তা অনুচিৎ। যতটুকু সম্ভব সাধারণভাবে পর্দাসহ থাকা প্রয়োজন। স্মরণ রাখতে হবে হজ্ব কোন মেলার নাম নয়, এটা প্রভুর সামনে গোলামের হাজিরা দেওয়া।

একদিন আব্দুল হাফিজ মক্কীর মাহফিলে :

কা'বার চত্বরে প্রতিদিন বেশ কিছু মাহফিল হয় বিভিন্ন ভাষায়। বাদ মাগরিব বয়ান করেন শায়েখ আব্দুল হাফিজ মক্কী-হেজাজী, উর্দুতে। তিনি মক্কায় হানাফী মাজহাবের প্রতিনিধি, বড় আলেম। তাঁর পৈত্রিকালয় পাকিস্তান। তিনি দারুল উলুম দেওবন্দ ধারার আলেম, বেশির ভাগ বয়ান করেন তাওহীদের বিষয়াদী নিয়ে। একদিন বাদ আসর তাঁর মিম্বরের পাশাপাশি বসার উদ্দেশ্য নিয়ে গিয়ে আশাহত হলাম, শ্রোতাদের প্রচন্ড ভীড়, পিছনে বসেই বয়ান শুনতে হবে। বাদ মাগরিব বয়ান হবে, কয়েকজন তরুণ আয়োজনে ব্যস্ত, আমি

দাঁড়িয়ে আসন খুঁজছিলাম। আয়োজকদের একজন ইশারা করলেন সামনে যেতে। কয়েকজনকে টপকিয়ে গিয়ে ইশারাকারীর পাশে বসলাম, সালাম দিয়ে মুসাফা করতেই তিনি জানতে চাইলেন-কেমন আছেন?

আশ্চর্য! তিনি বাংগালী। লেখাপড়া করেন মক্কায়। শায়খের ছাত্র। আমার কিংবা তার কারোই স্মরণ হচ্ছে না পূর্ব পরিচয়ের স্মৃতি, তবে উভয়েই অনুভব করলাম ইতিপূর্বে কোথাও দেখা হয়েছে। মাগরিবের আযান হলো, জামাত হলো, শায়েখ এলেন, বয়ান শুরু হলো। তিনি খুব ভাল বক্তা। বিদাত-শিরকের বিরুদ্ধে বললেন, বললেন প্রকৃত ইশক্-এ-রাসুল (সাঃ) এর নিদর্শন। তিনি বলেন- যা কোরআন-হাদিসে ইবাদত বলা হয়নি তা ইবাদত মনে করার নামই বিদ'আত। বিদা'আত জঘন্যতম পাপ, জাহান্নামের অংশ। আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুকে ইলাহ মানা শিরক। শিরক কুফরী। আশিকে রাসুল এমন হতে হবে যেমন ছিলেন সাহাবায়ে কেরাম। খ্রীষ্টানরা যেমন হযরত ঈসা ইবনে মরিয়মের ইবাদত করে তেমনি কেউ যদি আশিকে রাসুল হয়ে ইবাদত শুরু করে দেয় তবে তা হবে শিরক।

আলোর পাহাড় :

জবনে নূর, মানে আলোর পাহাড়। মক্কা শহর থেকে তিন মাইল দূরে। পৃথিবীর সামাজিক অন্ধকারাচ্ছন্নতা মোহাম্মদ (সাঃ) এর হৃদয়ে বেদনাময় অনুভূতি জাগ্রত করে, তিনি ভাবিত হন। চিন্তার সাগরে সাঁতার কেটে কেটে তিনি নির্জনতা প্রিয় ও স্বল্পভাষী হয়ে উঠেন। নিরব-নিভৃতের সন্ধানে তিনি চলে যান জবলে নূরের চূড়ায়। খুঁজে বের করেন এই গুহা-গারে হেরা। তিনি মানব সমাজের মুক্তির চিন্তায় ধ্যানমগ্ন হয়ে ভাবেন আট হাত দৈর্ঘ্য এবং দু'হাত প্রস্থ এই গুহায় বসে, সেজদা দিয়ে। কোন কোন সময় সপ্তাহ-মাস চলে তাঁর ধ্যানমগ্ন অবস্থায়। প্রতিদিন হযরত খাদিজা (রাঃ) তাঁর জন্য সেখানে খাবার নিয়ে যেতেন। চল্লিশ বছর যখন তাঁর পূর্ণ হলো একদিন জিব্রাঈল নিয়ে এলেন মানবতার মুক্তির সনদ-আল-কোরআন। শুরু হলো নতুন আঙ্গিকে সত্য-মিথ্যার লড়াই।

হযরত (সাঃ) এর গারে হেরার জীবনী যখনই পড়তাম ইচ্ছে হতো দেখার। দীর্ঘদিনের লালিত ইচ্ছে আজ সুযোগ পেয়েও যদি পূরণ না করি তবে বাকী জীবন অনুতাপে যাবে। যাকেই বলি গারে হেরা দেখতে যাবো সে-ই দেয় মাথায় হাত, আরে বাবা ! এত উঁচুতে কে উঠবে?

জবলে নূরের চূড়ায় গারে হেরা। আমার জানা ছিলনা জবলে নূরের উচ্চতা। যত উঁচুতে হোক না কেন আমাকে তা দেখতেই হবে। আরে যতই কষ্ট হোক আমি মাত্র একবার উপলদ্ধি করবো কেমন করে আমার রাসুল (সাঃ) প্রতিদিন এই পাহাড়ের চূড়ায় যেতেন-কেমন করে যেতেন আম্মাজান খাদিজা (রাঃ) প্রতিদিন রাসুল (সাঃ) এর জন্য খাদ্য নিয়ে? আমার কাকুতিতে শেষ পর্যন্ত রাজী হলেন রাহবারীতে সৈয়দপুরের আব্দুর রহীম, তিনি দীর্ঘ দিন থেকে মক্কায় আছেন জীবিকার তাগিদে। আমরা একটা গাড়ী নিয়ে সকাল নয়টার দিকে পৌঁছি জবলে নূরের পাদদেশে। আসার সময় আমাদের সাথী হয়েছিল আরো ক'জন। পাহাড়ের উচ্চতায় আতংকিত হয়ে দুজন ফিরে আসেন হোটেলে। আমি, হাফেজ সৈয়দ কফিল আহমদ এবং আব্দুর রহীম পাহাড়ের উপরে উঠতে থাকি। বিশ্রামহীন অনবরত হেটে আমরা আনুমানিক ত্রিশ-পয়ত্রিশ মিনিটে পৌঁছে যাই পাহাড়ের চূড়ায়। পথে পথে পাহাড়ের

সমতল অংশে এবং পাহাড়ের চূড়ায় অনেক গুলো খাবারের স্টল রয়েছে। জবলে নূরের চূড়ায় উঠে পিছন দিকে বেশ কিছু জায়গা নেমে গারে হেরা। হাফেজ কফিল ও আব্দুর রহীম নীচে যেতে চাচ্ছেন না। আমি তাদেরকে রেখে নীচে চলে যাই। দুই পাথরের সরু পথ অতিক্রম করে গারে হেরা। মানুষের ভীড় প্রচন্ড। আমি কোন মতে সরু পথ অতিক্রম করে গারে হেরার মুখে গিয়ে দাঁড়ালাম। ভেতরে গিয়ে দু'রাকাত নামাজের চেষ্টায় মানুষের ধাক্কা-ধাক্কি। এই নামাজ কোন ফরজ, সুন্নত, নফল, মুস্তাহাব কিছুই নয়। কেউ যদি এই নামাজকে জরুরী কিংবা পূণ্যের কাজ ভাবে তবে অবশ্যই পাপ হবে। হযরত নবী করিম (সাঃ) এর প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি আর গারে হেরায় ধাক্কাধাক্কি করে নামাজ পড়া সমার্থক নয়। নারী-পুরুষের ধাক্কাধাক্কিতে যে পর্দা লঙ্ঘিত হয় তা অবশ্যই হারাম। হযরত নবী করিম (সাঃ), হযরত খাদিজা (রাঃ) প্রতিদিন কষ্ট করে কিভাবে পাহাড়ের চূড়ায় উঠতেন তা দেখে কষ্টানুভূতি নেওয়া ভাল কিন্তু তা যেমন হজ্বের কোন অংশ নয় তেমনি জরুরীও নয়। যারা রাসুল (সাঃ) এর স্মৃতি বিজড়িত জিনিসগুলো দেখতে যান তাদের উচিত স্মরণ রাখা যে, রাসুল (সাঃ) এর প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি আর রাসুল (সাঃ) এর ইবাদত সমান নয়। যা রাসুল (সাঃ) করেননি বা করতে বলেননি, যা কুরআন-হাদিসে নেই কিংবা হযরত সাহাবায়ে কেরামদের আমলে পাওয়া যায় না তাই বিদ'আত। বিদ'আতই ভ্রষ্টতা এবং প্রতিটি ভ্রষ্টতা জাহান্নামী।

যে পাহাড়ের চূড়ায় গারে সূর :

মক্কার কাফের সর্দারগণ যেদিন দারুন নদওয়ার বৈঠকে সিদ্ধান্ত নিলো হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) কে হত্যার, সে রাত-ই নবী তাঁর বন্ধু আবু বকরকে সাথে নিয়ে মদিনার পথে যাত্রা শুরু করেন। রাত যখন শেষ প্রান্তে তখন তারা সামনে অগ্রসর না হয়ে একটি উঁচু পাহাড়ের চূড়ায়-একটি গুহায় আত্মগোপন করেন। এই গুহায় তারা ক'দিন থেকে মদিনার পথে যাত্রা শুরু করেন। এই গুহার নামই- গারে সূর। না, আমার পক্ষে পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছা সম্ভব হলো না। জবলে নূর থেকে নেমে আমরা চলে আসি সূর গুহার পাহাড়ের নিচে। পাহাড়ের উচ্চতা জবলে নূর থেকে কম নয়। মক্কার কাফেরগণ হেরার নূর কে স্তব্ধ করতে- রাসুল (সাঃ) কে হত্যা করতে- বড় শয়তানদের কর্তৃক ঘোষিত পুরস্কারের লোভে এই পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছে সূর গুহার কাছাকাছি হয়ে গিয়েছিল, গুহার ভিতর দেখার ইচ্ছেও প্রকাশ করেছিলো । গুহার মুখে মাকড়শার জাল বিস্তার দেখে তারা বিভ্রান্ত হয়ে ফিরে গেলো। এই গুহায় হযরত আবু বকর (রাঃ) কে বিষাক্ত সাপ দংশন করেছিলো। সাপের দংশনের বিষ তাঁর সারা শরীরে পৌঁছে জ্বালাতন করলেও তিনি টু শব্দ করেননি যদি রাসুল (সাঃ) এর ঘুম ভেঙ্গে যায়। আবু বকরের চোখের পানিতে রাসুল (সাঃ) এর ঘুম ভাঙ্গে। আবু বকর কি হয়েছে তোমার, বাড়ীর কথা কি মনে উঠছে? প্রত্যুত্তরে হযরত আবু বকর (রাঃ) সাপে দংশনের কথা বললেন। হযরত নবী করিম (সাঃ) সাথে সাথে মুখ থেকে থু থু বের করে দংশনকৃত স্থানে লাগিয়ে দিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) সুস্থ হয়ে যান। এক মাইল উঁচু এই পাহাড়ের চূড়ায় গুহার ভেতর তিনদিন তিন রাত থেকে চর্তুথ দিনে তারা মদিনার পথে যাত্রা শুরু করেন। কাফেররা তাদেরকে খুঁজে পায়নি। আমি এই পাহাড়ের নীচে দাঁড়িয়ে ভাবি হযরত রাসুল (সঃ) ও হযরত আবু বকর (রাঃ) এর আত্মগোপনের ইতিহাস, ভাবি মুল্লা

ওমর ও উসামা বিন লাদেনের আফগানিস্তানের গুহায় আত্মগোপন এবং বিশ্বের সকল শক্তি-পরাশক্তি-প্রযুক্তি মিলেও তাদেরকে খুঁজে না পাওয়ার রহস্যের কথা।

মদিনার পথে যাত্রা :

হযরত নবী করিম (সাঃ) এর পদস্পর্শে ইয়াসরেব হলো মদিনাতুন নববী, মানে নবীর শহর। মদিনা ইসলামের ইতিহাসে প্রথম গৌরবোজ্জল শহর যেখানে হযরত রাসুল (সাঃ) স্বাধীনভাবে ইসলামের প্রধান কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, মদিনাকে কেন্দ্র করেই ইসলামের শিক্ষানীতি, রাষ্ট্রনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি ও যুদ্ধনীতি ইত্যাদি প্রণীত হয়েছিলো। মদিনার বরকতের জন্য স্বয়ং রাসুল (সাঃ) দোয়া করেছেন। মদিনাকে স্বয়ং রাসুল (সাঃ) পবিত্র নগরী হিসেবে স্বীকৃত দিয়েছেন। জীবনের শেষ দশ বছর মহানবী (সাঃ) মদিনায় থেকেছেন। হযরত নবী করিম (সাঃ) এর কবর এই শহরে। যারা এই শহরে মৃত্যু বরণ করবে তাদের জন্য সুপারিশ স্বয়ং রাসুল (সাঃ) করবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। দাজ্জাল এই শহরে প্রবেশ করতে পারবে না। এই শহর চোখের আলো, হৃদয়ের শান্তি। এই শহরের চারিদিকে শুধু উপদেশ আর উপদেশ। এই শহরের গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু ঘর রয়েছে। যেমন- মসজিদে নববী, মসজিদে কোবা, মসজিদে জুম্মা এবং ঐ সকল মসজিদে যে গুলোতে হযরত নবী করিম ও তাঁর প্রিয় সাহাবীগণ নামাজ পড়েছেন, ইসলামের প্রচার- প্রসারের চেষ্টা করেছেন। চিন্তকদের জন্য এখানে কোরআন-হাদিস, জিহাদ সমূহের ইতিহাস এবং হযরত রাসুল (সাঃ) এর মোজেজার নির্দশন পাওয়া যায়। এই শহর সম্মানিত হয়েছে হযরত রাসুল (সাঃ) কে আশ্রয় দিয়ে। এই শহরের মাটির গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে রাসুল (সাঃ) এর দেহ ধারণ করে।

এই শহর পৃথিবীর দ্বিতীয় সম্মানিত শহর। আমরা যারা দূর-দূরান্ত থেকে হজ্ব কিংবা উমরার উদ্দেশ্যে মক্কায় যাই তাদের জন্য মদিনায় গিয়ে মহানবী (সঃ) এর মাজার জিয়ারত না করে আসা অত্যন্ত কৃপণতা। তবে মদিনায় যাওয়া হজ্বের বিধানের অর্ন্তভূক্ত নয়। আমাদের অনেকের ধারণা হজ্বের সময় মদিনায় গিয়ে মসজিদে নববীতে চল্লিশ ওয়াক্ত নামাজ জামাতে আদায় করা হজ্বের অংশ। এমন ধারণা সহীহ নয়। চল্লিশ ওয়াক্ত নামাজের বিধানটা ভিন্ন। এটা হজ্বের কোন অংশ নয়। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত মহানবী (সঃ) বলেছেন- যে ব্যক্তি আমার মসজিদে পূর্ণ চল্লিশ ওয়াক্ত নামাজ পড়বে সে নেফাক থেকে মুক্ত। (তারগীব ও তারহীব)। এই হাদীসে মসজিদে নববীতে নামাজের গুরুত্ব বর্ণনা করা হলেও তা হজ্বের জন্য নির্দিষ্ট নয় এবং তা না করলে হজ্বের কোন ক্ষতি হবে না। মসজিদে নববীতে নামাজের ফজিলত অনেক কিন্তু মসজিদে হারাম থেকে বেশি নয়। হাদিসে আছে, মহানবী (সঃ) বলেছেন- "আমার এ মসজিদে এক ওয়াক্ত নামাজের সাওয়াব হাজার হাজার ওয়াক্ত নামাজের চেয়ে উত্তম। কিন্তু মসজিদে হারামের কথা ভিন্ন। কারণ মসজিদে হারামে জামা'আতের সাথে নামাজ পড়ার সাওয়াব অন্যান্য মসজিদে তুলনায় একলাখ ওয়াক্ত নামাজ থেকে উত্তম।" (তারগীব)। কেউ যদি মসজিদে হারাম থেকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে মদিনায় থাকেন তবে তা অনুচিৎ। হযরত নবী করিম (সঃ) এর শহর মদিনা,

তা অবশ্যই আমাদের কাছে সম্মানিত কিন্তু বায়তুল্লাহ থেকে বেশি নয়। আমি মদিনায় যাচ্ছি রুসূমাতে আসক্ত হয়ে নয়, আমি যাচ্ছি হযরত রাসুল (সঃ) কে যে শহর আশ্রয় দিয়ে ধারণ করেছে সেই শহর দেখতে। আমি যাচ্ছি হযরত রাসুল (সঃ) এর রওজা জিয়ারত করতে।

মুয়াল্লিমের গাড়ী দিয়ে আমরা মদিনায় যেতে চাচ্ছিনা স্বাধীনভাবে দেখতে দেখতে যাওয়ার স্বার্থে। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম প্রাইভেট গাড়ীতে যাওয়ার। মুয়াল্লিম অফিসে যোগাযোগ করা হলে তারা জানালেন "এমন নিয়ম নেই।" প্রচুর তর্ক বিতর্কের পর শেষ পর্যন্ত এই শর্তে অনুমতি পাওয়া গেল যে, আমাদের প্রাইভেট গাড়ীর ড্রাইভারকে নিয়ে তাদের অফিসে আসতে হবে। তাই করলাম। সাত সীটের গাড়ী নিয়ে আমরা ৫ ফেব্রুয়ারী ০২ বাদ ফজর মদিনার পথে যাত্রা শুরু করি। "তরীকুল হিজরাহ" (হিজরতের পথ) নাম সড়ক দিয়ে প্রাইভেট গাড়ীতে চার-পাঁচ ঘন্টায় মদিনায় পৌঁছা যায়। কিন্তু বিভিন্ন চেকপোষ্ট অতিক্রম এবং চা-নাস্তায় বিরতি ইত্যাদিতে বেশ সময় চলে যায়। যানজটহীন দীর্ঘ এবং প্রশস্ত সড়ক দিয়ে দ্রুত গতিতে গাড়ী চালিয়ে অনেক গুলো মরুভূমি, পাহাড়, গ্রাম, শহর ডিঙ্গিয়ে আছর-মাগরীবের মাঝামাঝি সময় আমরা নবীর শহর মদিনায় পৌঁছি।

এই শহর ইতিহাসে ৯৫টি নামে পরিচিত। যার মধ্যে প্রসিদ্ধ হচ্ছে- তাইবাহ, আল-আসেমাহ, বাইয়াতে রাসুলুল্লাহ, আল-মুসলিমা, আল-মুহাব্বারাহ, দারুল ফাতহ, হারামে রাসুলুল্লাহ, আল-নাখল, সাইয়্যেদাতুল বোলদান, আল-বারাহ, আল-জাবেরাহ, কুব্বাতুল ইসলাম, আল-মুখতারাহ, দারুল আবরার, আল-মুমেনা, দারুস সুন্নাহ, দারুল আখইয়ার, আদ দিয়ারুল হাসেমা, আল-হেরার, আল-মোবারাকা, ইয়াসরিব। হযরত নবী করিম (সঃ) এর হিজরতের পূর্ব পর্যন্ত মদিনার নাম ইয়াসরিব ছিলো। গাড়ীর ড্রাইভার আমাদেরকে মসজিদে নববীর প্রধান গেটের সামনে দিয়ে বিদায় নিলো। আমরা একটি টেলিফোন বক্স থেকে হোটেল "দারে মাহাব্বা" তে ফোন করলাম। এই হোটেলে আমাদের জন্য ব্যবস্থা করেছেন আমার বাবার খুব ঘনিষ্টজন, সিলেটের মাহফুজ ট্রেভেল্স এর মালিক সৈয়দ আবুল ফজল সাহেব। আমাদের টেলিফোন পেয়ে আবুল ফজল চাচার পরিচিত বাবু মিয়া এলেন আমাদেরকে নিয়ে যেতে। আইনী জটিলতার কারণে তার সাথে হোটেল মালিকও আছেন। বাবু মিয়ার বাড়ী সিলেটের গোলাপগঞ্জে, তিনি সেখানে একটি ওয়ার্কসপের মালিক। আবুল ফজল সাহেবের মাধ্যমেই তার সৌদিতে আসা। হোটেলের মালিক মোহাম্মদ জমির উদ্দিন আমার বয়সী, চট্টগ্রামের লোক।

প্রথম দিনেই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠে। হোটেলে আমাদের খাওয়ার দায়িত্ব যিনি নিয়েছেন তার নাম নুরুল হক। আমরা মদিনায় যে ক'দিন ছিলাম প্রতিটি মূহুর্ত বাবু মিয়া, নুরুল হক এবং হোটেল মালিকের বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা পেয়েছি। বুঝতেই পারিনি আমরা যে এই শহরে নবাগত।

মসজিদে নববী :

হযরত রাসুল (সঃ) এর হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী মুসলমানরা মাত্র তিনটি মসজিদের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করতে পারেন- (১) মক্কায় অবস্থিত মসজিদুল হারাম (২) মদিনার মসজিদে নববী, (৩) ফিলিস্তিনের আল-আকসা মসজিদ। মক্কা-মদিনা জিয়ারতে এসে ফিলিস্তিন আর মসজিদুল আকসার জন্য হৃদয়টা কেঁদে উঠে। ইসলামের প্রথম কেবলা- হযরত রাসুল

(সঃ)এর মে'রাজের স্মৃতি বিজড়িত মসজিদুল আকসা আজ প্রায় একশ বছর থেকে ইহুদী-খ্রীষ্টানদের দখলে। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সময় তুর্কি খিলাফতের সৈন্যদেরকে হটিয়ে তৎকালিন বৃটিশ আধিপত্যবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শাসক ফিলিস্তিন দখল করেছিলো। বৃটিশরা ছেড়ে আসার এক বছর পূর্বে জাতিসংঘ নামী নির্বীয সংস্থার অফিসে বসে আমেরিকা-বৃটেন এবং তাদের মিত্ররা ফিলিস্তিনকে দ্বি-খন্ডিত করে ৫৬শতাংশ জায়গা ইহুদীদেরকে দিয়ে দেয় ইসরাইল নামক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য। বৃটিশরা 'বেলফোর' ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিন ছাড়ার কিছুক্ষণ পূর্বে ঘোষণা করে- আজ থেকে ফিলিস্তিন হবে ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাইল। এটা যেন 'হাওড়ের গরু মামা শ্বাশুরের দান' কার দেশ কে কাকে দেয়(!)। ফিলিস্তিনীরা সেই থেকে যুদ্ধ করছে তাদের মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য-বিশ্ব মুসলিম লড়াই করছে আল-আকসার মুক্তির জন্য।

ইসলামের ইতিহাসে মসজিদে নববীর স্থান দ্বিতীয়। এই মসজিদ নির্মাণে স্বয়ং নবী করিম (সঃ) অংশ নিয়েছেন- মাটি ও পাথর সরানোর কাজে কর্মরতদের সাহায্য করেছেন। পরবর্তীতে তিনি নিজেই মসজিদকে সম্প্রসারিত করেছেন। ইসলামের প্রথম শিক্ষা কেন্দ্র "সুফফা" হযরত নবী করিম (সঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় মসজিদে নববীকে কেন্দ্র করে। এই প্রতিষ্ঠানে কোরআন হাদিস ভিত্তিক দৈহিক, মানবিক, নৈতিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক, রাষ্ট্রনীতি, পৌরনীতি, রণকৌশল, অর্থনীতি ইত্যাদি হাতে কলমে শিক্ষা-প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। ইসলামে যে সকল বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ ফরজ সেটাই ছিলো মাদ্রাসায়ে সুফফার প্রাথমিক শিক্ষা। আমরা ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই মাদ্রাসায়ে সুফফার প্রাথমিক শিক্ষায় ছিলো- (১) ঈমানের বিষয়াদী শিক্ষা, (২) ইবাদতের পদ্ধতি শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ, (৩) চরিত্র গঠন, (৪) স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সচেতনতা, (৫) নিত্য প্রয়োজনীয় হিসাব শিক্ষা, (৬) জাগতিক ও পরকালিন দৈনন্দিন কাজ গুলি পরিচালনার নিয়ম, নীতি, আদব, পদ্ধতি ইত্যাদি শিক্ষা।

মদিনা কেন্দ্রিক খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রাথমিক শিক্ষা পর্যন্ত ছাত্রদের খরচ বহন করা হতো রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে। এরপর যাদের সামর্থ ছিলো তারা পান্ডিত্য অর্জনে এগিয়ে যেতেন। হযরত নবী করিম (সঃ) এর জীবদ্দশায়ই মদিনার আশ-পাশে মাদ্রাসায়ে সুফফার অনুকরণে আরো অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। সেই সব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক হতেন সুফফার ডিগ্রীপ্রাপ্তরা পৃথিবীর দিক-দিগন্তে। মুসলিম আরবদের সংস্পর্শে এক সময় স্পেনের সদর দরজা দিয়ে জ্ঞানের আলো গোটা ইউরোপকে স্পর্শ করে। পৃথিবীর গড় আয়ূ হিসেবে আমেরিকার জন্ম সেদিন মাত্র। মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশে আমেরিকার ভূমিকা নাবালকের মতোই। আজ আমেরিকায় যা আছে সবই ইউরোপের অবদান। আর ইউরোপকে সবই দিয়েছে আরব মুসলিমরা। অনেকে মুসলমানদের অবদান উপেক্ষা করতে গিয়ে বলেন- ইউরোপিয়ান সভ্যতা গ্রীক থেকে আগত। আমরা তাও যদি মেনে নিয়ে প্রশ্ন করি- ইউরোপিয়ানরা গ্রীক দর্শনের সাথে পরিচিত হলো কি ভাবে? নিশ্চয় উত্তর হবে-আরব মুসলিমদের মাধ্যমে। এই যোগসূত্রের হিসাবেই একথা স্পষ্ট যে ইসলামই মানুষকে মধ্যযুগের জাহেলিয়াত থেকে আলোর পথ দেখিয়েছে। এ ক্ষেত্রে মসজিদে নববীর অবদান সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। মসজিদে নববীর অবদান শুধু শিক্ষা ক্ষেত্রে নয়, মানুষের মঙ্গলজনক প্রতিটি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। এই মসজিদকে কেন্দ্র করেই হযরত নবী করিম (সঃ) আল্লাহর

নাযিলকৃত ওহীর জ্ঞান প্রচার করতেন, ইসলামী বিধি-বিধানের জ্ঞান দিতেন এবং ব্যক্তি থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কার্যকরের পদক্ষেপ গ্রহন করতেন, সাধারণ মানুষের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতেন, বিচার কার্য পরিচালনা করতেন। ইসলামের রাজনৈতিক দর্শন খিলাফতের প্রধান কার্যালয় ছিলো মসজিদে নববী। হযরত আবু বকর, ওমর, উসমান (রাঃ)-এর খিলাফতের সময় পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত ছিলো। মোট কথা হযরত নবী করিম (সঃ) থেকে শুরু করে পরবর্তী প্রধান তিন খলীফার সময় পর্যন্ত ইসলামের ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক রাজধানী ছিলো মদিনা। পরবর্তীতে এই কেন্দ্রের কাজ কুফা, দামেশক কিংবা অন্যান্য শহরে স্থানান্তর করা হলেও মদিনা আর মসজিদে নববী আজো মুসলিম উম্মাহের অন্তরে অত্যুজ্জ্বল আসনে অধিষ্টিত। মসজিদে নববীতে এক ওয়াক্ত নামাজ অন্য মসজিদে হাজার হাজার ওয়াক্ত নামাজ থেকে উত্তম (তবে মসজিদে হারামের কথা ভিন্ন)। মসজিদে নববীতে কেউ যদি চল্লিশ ওয়াক্ত নামাজ জামাতের সাথে আদায় করে আল্লাহ পাক লিখে দেন সে জাহান্নাম থেকে মুক্ত।

মসজিদে নববীর নির্মাণ ও সম্প্রসারণ :

মক্কার কাফেরদের কর্তৃক নির্যাতীত হয়ে হযরত মোহাম্মদ (সঃ) মদিনায় হিজরত করেন। যেদিন তিনি প্রথম মদিনায় আগমন করেন সেদিন মদিনার বড় বড় সর্দার থেকে শুরু করে সর্বস্তরের মানুষের ইচ্ছে ছিলো রাসুল (সঃ) আমার ঘরে মেহমান হোন। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সলুলের মতো প্রভাবশালী ব্যক্তিরও এই আকাংখা ছিলো। কিন্তু হযরত রাসুল (সঃ) কারো আমন্ত্রণ গ্রহণ না করে ঘোষণা দিলেন-"আমার উটনীর লাগাম ছেড়ে দাও। সে স্বেচ্ছায় যেখানে নামবে সেখানে হবে আমার অবস্থান।" সেদিন উটনী গিয়ে হাঁটু গেড়েছিলো বনী নাজ্জার গোত্রের নাকী ইবনে তালাহার দু'এতিম ছেলে সাহল ও সুহাইলের খেঁজুর শুকানোর স্থানে। এই স্থানেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পৃথিবীর দ্বিতীয় সম্মানিত মসজিদ-মসজিদে নববী। প্রথম দিকে এই মসজিদ ছিলো সত্তর কিউবিট লম্বা এবং ষাট কিউবিট প্রস্থ। সমগ্র মসজিদের আয়তন ছিলো ৪২০০ এবং উচ্চতা ছিলো ৫ কিউবিট। হিজরতের ৭ম বর্ষে খায়বার বিজয়ের পর হযরত নবী করিম (সঃ) কর্তৃক মসজিদটি ভেঙ্গে পুনঃ নির্মাণকালে দশ হাজার বর্গকিউবিট সীমানা বিস্তৃত করা হয়। সেই সময়ে মসজিদের তিনটি দরজার একটি মসজিদুল আকসার দিকে ছিলো। কেবলা পরিবর্তনের সাথে সাথে তা বন্ধ করে বদর যুদ্ধের মাত্র দু'মাস পূর্বে কা'বার দিকে একটি দরজা তৈরী করা হয়। সেই সময়ের মসজিদ ছিলো মাটি আর পাথরের তৈরী, খুঁটি গুলো ছিলো খেঁজুর গাছের গুঁড়ি দিয়ে। সাত কিউবিট উচ্চ ছাদ ছিলো তালপাতার ডাঁটা ও পাতা দিয়ে।

পৃথিবীর অন্যান্য মসজিদ থেকে মসজিদে নববীর একটি পৃথক বৈশিষ্ট্য হলো এই মসজিদের যতই সম্প্রসারন করা হোক তা মসজিদের অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে। কারণ মহানবী (সঃ) বলেছেন; "যদি এই মসজিদটি সানা পর্যন্ত সম্প্রসারিত হত তবু এটা আমার মসজিদ হিসাবেই গণ্য হত।"

১৭ হিজরীতে দ্বিতীয় খলিফা ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) এর সময় মসজিদ ১৪০ কিউবিট লম্বা এবং ১২০ কিউবিট প্রস্থ এবং ১১ কিউবিট উচ্চ করে দ্বিতীয় দফা সম্প্রসারণ এবং মসজিদের সীমা বাড়িয়ে ১৪০০ বর্গকিউবিট করা হয়। ২৮-৩০ হিজরীতে তৃতীয়

খলিফা হযরত ওসমান (রাঃ) এর সময়ে কেবলা উত্তর ও দক্ষিণ দিকে ১০ কিউবিট করে বৃদ্ধি করা হয়। সম্প্রসারণ কাজে উন্নত পাথর এবং খুঁটি হিসেবে ইস্পাতের পাত ব্যবহার করা হয়। 'টিক' কাঠ দিয়ে মসজিদের ছাদ নির্মাণসহ মোট ৪৯৬ বর্গ মিটার এলাকায় সম্প্রসারণ কাজ পরিচালিত হয়। ৮৮ হিজরীতে উমাইয়া খলিফা ওয়ালিদ ইবনে আব্দুল মালেক মসজিদে নববী সম্প্রসারণ ও নতুনভাবে সজ্জিত করণের এক আদেশ জারি করেন, যা বাস্তবায়িত হতে পাঁচ বছর লেগে যায়। এই সম্প্রসারণের ফলে মসজিদ প্রস্থে ২০০ কিউবিট, সম্মুখে ও পিছনে ২০০ কিউবিট এবং নিকটবর্তী স্থানে লম্বায় ১৮০ কিউবিট বিস্তৃতি লাভ করে। এই সম্প্রসারণে বাঁঝা ও নকশাকৃত পাথর ব্যবহার এবং স্তম্ভসমূহ স্টীল ও সীসা দিয়ে শক্ত করা হয়। ভিতরের দেয়ালগুলো মার্বেল পাথর, স্বর্ণ ও মোজাইক পাথরে সজ্জিত করা হয়। এই সময় ২৩৬৯ বর্গমিটার এলাকাব্যাপী সম্প্রসারণ কর্ম বিস্তৃত হয়। এই সময় মসজিদে মিনার সংযুক্তির সাথে সাথে মসজিদের পূর্ববর্তী আয়তনের সাথে নতুন স্থান এবং গমনাগমনের পথ সংযোজিত হয়। মসজিদের চার কোণে যে চারটি মিনার সংযুক্ত করা হয়েছিলো তা আজো মসজিদের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল মজিদের সময়ে আরেকটি নতুন মিনার স্থাপন করা হয়। এই মিনারটি প্রথম সউদের সম্প্রসারণের সময় সরিয়ে ফেলা হয়।

৬৫৪ হিজরীতে মসজিদে নববীতে আগুন লেগে পুড়ে গেলে আব্বাসী খলিফা মুতাসিম বিল্লাহ খুব দ্রুত মেরামতের সাথে সথে কিছু অংশে সংস্কার সাধন করেন। বাগদাদে তাতারী হামলায় আব্বাসী শাসনের পতন ঘটলেও মসজিদের কাজ অব্যাহত থাকে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন মিশরের আল-মনসুর, নুরুদ্দীন আল-সালেহী, ইয়ামনের আল-মুজাফফর শামসুদ্দিন ইউসুফ, মিশরের আল-জাহের রোকনুদ্দীন বেবারস, আল-নাসের মুহাম্মদ ইবনে গ্লার্ডন আল-সালেহী, আল-আম্যাবাট বাবসারী, আল-জাহের এবং সুলতান আশরাফ কিবতী প্রমুখ। তবে আব্বাসী খিলাফতের পর দীর্ঘ সময় কোন প্রকার সম্প্রসারণ হয়নি। নবম হিজরী শতাব্দী পর্যন্ত মসজিদের সৌন্দর্যবর্ধন উন্নয়ন এবং সংস্কার হয়েছে। নবম হিজরী শতাব্দীতে মসজিদে নববীতে আগুন লেগে বেশ কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্থ হলে মদিনাবাসী তৎকালীন শাসক আল-আশরাফ কিবতীর কাছে পত্র লিখেন। আল-আশরাফ কিবতী পত্র পেয়েই ক্ষতিগ্রস্থ স্থান মেরামত, নতুন ছাদ স্থাপন এবং প্রয়োজনীয় নতুন স্থান সংকুলানের ব্যবস্থা করেন। এই নতুন সম্প্রসারণের ফলে মসজিদের আয়তন দাঁড়ায় ১২০ বর্গমিটার। এরপর দীর্ঘদিন মসজিদে নববীতে বড় ধরণের কোন কাজের প্রয়োজন হয়নি। তুরস্কের খিলাফতে যখন সুলতান আব্দুল মজিদ তখন মসজিদের কিছু অংশ ফাটল দেখা দিলে খাদেম শায়েখ দাউদ পাশা বিষয়টি অবহিত করে সুলতানের কাছে পত্র লিখেন, এটা আল-আশরাফ কিবতীর ৩৮০ বছর পরের অর্থাৎ ১২৬৩ হিজরীর কথা। সুলতান আব্দুল মজিদ সংবাদ পেয়ে সাথে সাথে পর্যবেক্ষক প্রেরণ করেন এবং পর্যবেক্ষণের রিপোর্টের ভিত্তিতে ১২৬৫ হিজরীতে তুরস্ক থেকে একদল নির্মাণ কুশলী প্রেরণ করেন। দীর্ঘ ১৩ বছর ধারাবাহিক কাজ করে মসজিদ নতুন কাঠামোতে পুনঃনির্মাণ করা হয়। এই সময়ের সম্প্রসারণের ফলে মসজিদের আয়তন দাঁড়ায় মোট ১২৯৩ বর্গমিটার। সুলতান আব্দুল মজিদের পর বাদশা আব্দুল আজিজ বিন আব্দুর রহমান আল-সউদের শাসনামলের পূর্ব-পর্যন্ত মসজিদে নববীতে উল্লেখযোগ্য আর কোন সংস্কার হয়নি। এই দীর্ঘ সময়ে মসজিদের

কোন কোন অংশে আবার ফাটল দেখা দেয়। সউদ পরিবারের ক্ষমতা গ্রহণের পর ১৩৬৮ হিজরীতে প্রথম সউদ আব্দুল আজিজ বিন আব্দুর রহমান ইসলামী বিশ্বের দৃষ্টি আর্কষণের চেষ্টা করেন মসজিদে নববীর প্রতি। এই সময় কিছু সংস্কার সহ মসজিদের সীমানা সম্প্রসারণ করে ১৬,৫০০ বর্গমিটারে উন্নীত করা হয়। নতুন সম্প্রসারণ প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় সুলতান আব্দুল মজিদের সময়ের ৪,০৫৬ বর্গমিটার এলাকার সাথে সেই সময়ের করা মসজিদের ভিতরের কক্ষ সমূহ, সবুজ গম্বুজ, হযরত রাসুল (সঃ) এর নামাজের স্থান, মিম্বর, স্মৃতি স্তম্ভ সমূহ এবং প্রধান মিনার গুলো সংরক্ষণ করা হয়। প্রথম সউদ কর্তৃক সম্প্রসারণের পূর্বে মসজিদে নববীর যে পাঁচটি দরজা ছিলো তিনি এর সাথে আ্যরো পাঁচটি সংযোজন করেন। বাদশা ফয়সল বিন আব্দুল আজিজের শাসনামলে মসজিদের সীমানা আরো ৩৫০০ বর্গমিটার সম্প্রসারণ করা হলেও অবকাঠামোগত দিকে কোন পরিবর্তন করা হয়নি। এই সময় মসজিদের সাথে আরো ৫,৫৫০ বর্গমিটার চত্বর সংযোজন করা হয় অধিক মুসল্লী সংকুলানের উদ্দেশ্যে। বাদশা খালেদ বিন আব্দুল আজিজের শাসনামলে মসজিদের ভেতর ৪৩.০০০ বর্গমিটার এবং চত্বরে ৪৩,০০০ বর্গমিটার সম্প্রসারণ করা হয়। বাদশা ফাহাদ বিন আব্দুল আজিজের শাসনামলে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ উন্নত প্রযুক্তির সমন্বয়ে এবং দশ পর্বে বিভক্ত করে ব্যাপক সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দে এই প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর করেন স্বয়ং বাদশা ফাহাদ। মসজিদে নববীতে এটাই সর্বশেষ বড় ধরনের সম্প্রসারণ-সংস্কার-নির্মাণ কাজ। এই সময় মসজিদের এলাকা ১৬,৫০০ বর্গমিটার থেকে দশ গুণ বৃদ্ধি করে ১,৮৫.০০ বর্গমিটারে উন্নীত করা হয়। সরকারী তথ্যানুসারে মসজিদে নববী সম্প্রসারণের যে পরিকল্পনা সরকারের হাতে রয়েছে তা বাস্তবায়িত হলে হযরত নবী করিম (সঃ) এর সময়ের মদিনা শহরটাই মসজিদে নববীতে রূপান্তরিত হয়ে যাবে।

(The Tow Holy Masques- Published By Kingdom Of Saudi Arabian Misnistry Of Information).

মসজিদে নববীর সর্বশেষ অবস্থা :

বর্তমানে মসজিদের ভেতর ২,৮৫.০০০ (দুই লক্ষ পঁচাশি হাজার) এবং বাইরের চত্বরে ২,৫০.০০০ (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) নামাজীর স্থান সংকুলানের মতো জায়গা রয়েছে।

মসজিদে মিনার সর্বমোট দশটি। এর মধ্যে চারটা পুরাতন এবং ছয়টা নতুন। প্রতিটি মিনারের উচ্চতা ১০৪ মিটার। প্রধানত মসজিদের তিনটি সম্প্রসারণ এখনো উল্লেখযোগ্য

(১) হারামুল কদিম, অর্থাৎ পুরাতন বিল্ডিং। যা তুরস্কের খিলাফতের সময়ের। (২) আল-হাসরাতুল উলা, অর্থাৎ প্রথম সম্প্রসারণ। (৩) আল-হাসরাতুল ছানী, অর্থাৎ দ্বিতীয় সম্প্রসারণ, যা বাদশা ফাহাদের সময়ে বাস্তবায়িত হয়।

মসজিদের প্রধান প্রবেশ পথ ১৬টি, ছোট প্রবেশ পথ ১৪টি এবং মোট দরজা ৮৫ টি। চলন্ত সিঁড়ি ৬টি এবং সিঁড়ি ১৮ টি। স্থানান্তর যোগ্য অত্যাধুনিক ছাদ ২৭ টি। মসজিদ থেকে তিন মিটার দূরে অবস্থিত ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টন ক্ষমতা সম্পন্ন কেন্দ্রীয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।

২৫০০ টি শৌচাগার ও পানির ফোয়ারা। ছাদে বিভিন্ন উচ্চতার ৫.৬ মিটার ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট ৬৫টি গম্বুজ রয়েছে। মসজিদের ভেতর এবং বাইরে মোট ৫৪৩ টি CCTV

ক্যামেরা রয়েছে। ৩৫০০ টি স্পিকারের মাধ্যমে গোটা মসজিদের মধ্যে আওয়াজ পৌঁছানো হয়। মসজিদের দেয়ালে এবং ছাদে স্টীলের মধ্যে আরবী ক্যালিগ্রাফীর মাধ্যমে সৌন্দর্য বর্ধক চিত্রকর্ম স্থাপন করা রয়েছে। মসজিদের ভেতরে এবং চত্বরে তাপ নিয়ন্ত্রক মার্বেল পাথর বিছানো রয়েছে। দুই লেভেলের কার পার্কে আনুমানিক ৪৫০০ গাড়ী রাখা যায়।

মসজিদের নীচের তলা ৮২০০০ মিটার স্কোয়ারে মোট ১৬৭০০০ জন এবং উপরের তলায় ৬৭০০০ মিটার স্কোয়ারে ৯০০০০ জন নামাজির জায়গা হয়। মোট মসজিদের এলাকা হলো ১৬৫৫০০ মিটার স্কোয়ার। এখানে মোট ২৮৫০০০ নামাজির সংকুলান সম্ভব। মসজিদের চত্বর ১৩৫০০০ মিটার স্কোয়ার। এখানে ২৫০.০০০ জন নামাজী সংকুলান হয়। ভেতর এবং বাইর মিলিয়ে মসজিদের এলাকা হলো ৩০০৫০০০ মিটার স্কোয়ার এবং এই স্থানের ভেতর ৬৫০০০০ জন নামাজির সংকুলান হয়ে থাকে। মসজিদের সার্ভিস এলাকা হলো ৭৩৫০০ মিটার স্কোয়ার। মসজিদের ভেতর প্রতিটি প্রবেশ পথে সারিবদ্ধ ভাবে জমজমের পানির ব্যবস্থা রয়েছে। (তারিখে মদিনাতুল মনোয়ারা, কিসমুল মাসাজিদ)

মসজিদে নববীর উল্লেখযোগ্য দরজাগুলো :

বাবুস সালাম, বাবে আবু বকর সিদ্দীক, বাবে রহমত, বাবে হিজরত, বাবে কিবলাহ, বাবে মালিক সউদ, বাবে সুলতান আব্দুল মজিদ, বাবে ওমর ইবনে খাত্তাব, বাবে বদর, বাবে মালিক ফাহদ, বাবে ওহুদ, বাবে উসমান ইবনে আফফান, বাবে আলী ইবনে আবি তালিব, বাবে মালিক আব্দুল আজিজ, বাবে মক্কা, কাবে বিলাল, বাবে নিসা, বাবে জিব্রীল ইত্যাদি।

মসজিদে নববীর মিম্বর :

প্রথম অবস্থায় মসজিদে নববীতে কোন মিম্বর ছিলো না। হযরত নবী করিম (সঃ) একটি তালগাছের গোড়ায় দাঁড়িয়ে খোতবা দিতেন। হযরত নবী করিম (সঃ) এর সময়েই একজন মুসাফির মদিনায় সফরে এসে একটি মিম্বর তৈরী করে দেন। ঐতিহাসিকদের মতে প্রথম নির্মিত মিম্বরটি তিন থেকে চার সিঁড়ি বিশিষ্ট ছিলো। হযরত নবী করিম (সঃ) উপরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে খোতবা দিতেন। ৬৫৪ হিজরীতে হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) মিম্বরের সিঁড়ির সংখ্যা বাড়িয়ে ছয়ে উন্নীত করেন। পরবর্তীতে মসজিদে নববীতে আগুন লেগে মিম্বরটি পুড়ে গেলে ইয়ামনের শাসনকর্তা মুজাফফর নতুন একটি মিম্বর দান করেন। ৬৫৪ হিজরীতে জহীর বেবারস এই মিম্বর সরিয়ে নতুন একটি মিম্বর দান করেন।

৭৯৭ হিজরীতে এই মিম্বরের পরিবর্তে অন্য একটি মিম্বর দান করা হয়। ৮২০ হিজরীতে শায়েখ আল-মুয়াইদ এই মিম্বরের পরিবর্তে নতুন আরেকটি মিম্বর দান করেন। ৮৮৬ হিজরীতে মসজিদে নববীতে আগুন লেগে মিম্বরটি পুড়ে যায়। মদিনাবাসী এই সময় চুনকাম সহ পাকা একটি মিম্বর তৈরি করেন। ৮৮৮ হিজরীতে আশরাফ কায়তবী কর্তৃক মসজিদ সংস্কারের সময় মার্বেল পাথর দিয়ে একটি নতুন মিম্বর তৈরী করে দেন। দীর্ঘ একশ বছর এই মিম্বরটি ছিলো। ৯৯৮ হিজরীতে তুরস্কের সুলতান মুরাদ মূল্যবান কাঠ দিয়ে একটি সুদৃশ্য মিম্বর তৈরী করে উপহার দেন। আজো মসজিদে নববীর মিম্বরটি কাঠের তৈরি এবং বেশ উঁচু। গেট লাগানো। চমৎকার নক্সা কাটা।

মসজিদে নববীতে কিছু দিন :

মদিনার আবহাওয়া শীতল- মানুষ গুলোর মেজাজও। বৃষ্টি হয় প্রায়ই। আমরা যেদিন গেলাম সেদিনও বৃষ্টি ছিলো। মাল-পত্র হোটেলে রেখে খাওয়া-দাওয়ার পরই মাগরিবের আযান শুনতে শুনতে "তরিকে মালিক ফাহদ" (বাদশা ফাহদ রোড) দিয়ে মসজিদে নববীর দিকে এগিয়ে যাই। আযানের শব্দধ্বনি, দলে দলে মানুষের মসজিদের দিকে আগমন আমার স্মৃতিতে ঢেউ দিয়ে উঠে আজ থেকে চৌদ্দশ বছর আগের সেই মদিনা যেখানে বেলালের সুমধুর আযান ধ্বনিতে হযরত সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)গণ সবকিছু পিছনে ফেলে হাজির হতেন মহান প্রভুর সামনে, একমাত্র প্রভুর গোলাম হিসেবে। আজকের আযান যেমন বেলালের নয়- তেমনি কি আছে আমার ভেতর সাহাবাদের ঈমান? তবু আমি এগিয়ে গেলাম মিম্বরের দিকে- হায়, একদিন এই মসজিদের ইমাম ছিলেন সাইয়্যেদুল মুরসালিন-রাহমাতুল্লিল আ'লামীন হযরত মোহাম্মদ (সঃ), এর মুয়াজ্জিন ছিলেন হযরত বেলাল, মুসল্লি ছিলেন এমন সব ব্যক্তিদ্বয় যাদের প্রতি সন্তুষ্টির কথা স্বয়ং আল্লাহ রাব্বিল আ'লামীন ঘোষণা দিয়েছেন। যদি আমি সেদিনের মুসল্লি হতাম। মসজিদের ভেতর বেশিদূর এগিয়ে যাওয়া গেলো না। স্থানান্তর যোগ্য ছাদ গুলোর নীচ পর্যন্ত কোনভাবে পৌঁছলাম। জামাত এখনো শুরু হতে বেশ বাকী। আমি মসজিদে বসে ভাবছি হযরত রাসুল (সঃ) এর কথা, সাহাবাদের কথা, মুনাফেক সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সলুলের কথা। ভাবছি সেকালের ঢাল-পাতা-মাটির মসজিদ আর একালের টাইলস-মুজাইকের মসজিদ আর সেকালের ইমাম-মুয়াজ্জিন-মুসাল্লি এবং একালের ইমাম-মুয়াজ্জিন-মুসল্লি নিয়ে।

জামাত শেষে সামনের দিকে এগুতে শুরু করি জিয়ারাতুন নবী (সঃ) এর উদ্দেশ্যে। জিয়ারতের উদ্দেশ্যে আশিকে রাসুল (সঃ)-দের প্রচন্ড ভীড় "বাবুস সালাম" এ। কিছুটা ধাক্কা-ধাক্কিও আছে। আমি সেদিকে না গিয়ে বাবে হিজরত দিয়ে আবার মসজিদের ভেতর এসে "আল-হাসরাতুলউলায়" দাঁড়িয়ে সালাম ও দুরূদ পড়তে লাগলাম। অনেকে বিভিন্ন বই সামনে নিয়ে বিভিন্ন দোয়া-দুরূদ পড়ছেন। এমন দৃশ্য প্রায়ই আমার দৃষ্টি আর্কষণ করেছে। তাদের প্রেম-ভালোবাসা এশক্ ইত্যাদির প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই আমি বলতে চাই- সালামের নির্ধারিত কোন বাক্য নেই। কারো যদি আরবী বাক্য শুদ্ধ করে জানা না থাকে তবে দোয়া সমূহ নিজের মাতৃভাষায় বলাই উত্তম। আর সালামের জন্য শুধু "আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসুলুল্লাহ বললেই আদায় হয়ে যাবে। দুরূদ পাঠে না দেখে যেমন আন্তরিক হওয়া যায় তেমনি দেখে হওয়া যায় না। যারা আরবী পড়তে পারেন না তারা নিজের ভাষায় আরবী উচ্চারণ লেখা দেখে পড়তে গিয়ে ভুল উচ্চারণ করার ফলে অর্থ পাল্টে যায়। প্রতিটি মুসলমানের উচিৎ আরবী কোন ভাল ক্বারী সাহেবের কাছে উচ্চারণ শিখে নেওয়া। হজ্ব এবং জিয়ারতের দোয়া গুলো যদি আরবীতে উচ্চারণের আকাংখা হৃদয়ে থাকে তবে সেখানে যাওয়ার পূর্বে কোন আলেমের কাছে শিখে যাওয়া।

জিয়ারত শেষে বেরিয়ে আসতে বিভিন্ন স্থানে দেখা হলো বার্মিংহামের হাফিজ সালেহ, মাওলানা আব্দুল আউয়াল, শায়খে বরুণা মাওলানা লুৎফুর রহমান সাহেবের ছেলে মাওলানা

রশিদুর রহমান ফারুক সাহেব প্রমুখের সাথে। মসজিদ চত্বরের ভেতর থাকতেই এশার আযান হয়ে যায়। নামাজ শেষে হোটেলে ফিরে আসি।

সহবতে উলামা :

একদিন মসজিদে নববী থেকে জোহরের নামাজ শেষে বেরিয়ে আসতে দেখা হয়ে যায় হবিগঞ্জের মুহাদ্দিস সাহেব মাওলানা তফজ্জুল হকের সাথে। তাঁর চারিত্রিক মিষ্টি হাসিসহ তিনি আমায় বুকে জড়িয়ে জানতে চাইলেন- কবে এসেছো? কোথায় উঠেছো? অন্য কোন আলেমের সাথে দেখা হয়েছে কি না? ইত্যাদি।

আমি নিজের সম্পর্কে তথ্য জানিয়ে বললাম- শুনেছি মাওলানা সৈয়দ আসআদ মাদানী সাহেব এসেছেন, তবে দেখা হয়নি। মাওলানা ফারুক সাহেব আছেন, দেখা হয়েছে। হাটহাজারীর মুহাতামীম সাহেব মাওলানা আহমদ শফী আছেন অমুক হোটেলে। আহমদ শফি সাহেবের কথা শুনে তিনি ব্যস্ত হয়ে গেলেন- হুজুর কোথায়? আমি তাকে হোটেলের নাম বললাম। তিনি বললেন- চলো হুজুরের সাথে দেখা করে আসি। মসজিদ থেকে বেরিয়ে আসতে গিয়ে আমার জুতা খুঁজে পেলাম না। হয়তো কারো সাথে পাল্টে গেছে অথবা বিশাল মসজিদের কোথায় রেখেছি খুঁজে পাচ্ছি না। খালি পায়ে একটা জুতার দোকানে এসে দু'টা চপ্পল খরিদ করি, একটা আমার নিজের এবং অন্যটি মাওলানা তফজ্জুল হক সাহেবের জন্য। আমরা দু'জন একটা বাংলাদেশী হোটেলে খাওয়া-দাওয়া করে আহমদ শফি সাহেবের কক্ষে আসি। মাওলানা তফজ্জুল হক সাহেব হলেন মাওলানা আহমদ শফি সাহেবের ছাত্র। ছাত্র শিক্ষকের মিলনের অনুভূতি আমাকে দারুণ ভাবে নাড়া দেয়। আমি যখন আহমদ শফি সাহেবের সাথে মোসাফার উদ্দেশ্যে এগিয়ে গেলাম তখন মাওলানা তফজ্জুল হক সাহেব বেশ কিছু বিশেষণ যুক্ত করে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। আহমদ শফি সাহেব তাঁর প্রিয় ছাত্রের মুখে আমার প্রশংসা শুনে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বেশ সময় কাটালেন- আমার আত্মাটা খুব সুখী হলো পূণ্য আত্মার স্পর্শে। আহমদ শফি সাহেবের ছেলে মাওলানা আনাস আমার বয়সী, মোসাফা করতে করতে জানালো- আপনার বেশ লেখা পড়েছি। খুব দ্রুত আনাসের সাথে ঘনিষ্টতা হয়ে গেলো। আনাস আমাদেরকে আপেল আর মাল্টা কেটে খাওয়ালেন। আছরের আজান পর্যন্ত আমরা আহমদ শফি সাহেবের কক্ষে তাঁর সাথে আলাপ-আলোচনার ভেতর অতিবাহিত করলাম। বেশ কিছু মাসআলা নিয়েও আলোচনা হলো। তবে দেশ-বিদেশে বর্তমান ইসলামী আন্দোলনের অবস্থা, বাংলাদেশের উলামাদের অন্তঃদ্বন্দ্ব এবং ঐক্যের রূপরেখা ইত্যাদি নিয়েও দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। মাওলানা আহমদ শফি এবং মাওলানা তফজ্জুল হক সাহেবদ্বয়ের দ্বীনের প্রতি দরদ সত্যিই আমার হৃদয় ছুঁয়েছে।

ঐদিন আসরের নামাজ আমরা এক কাতারেই মসজিদে নববীতে আদায় করি। নামাজ শেষে যে যার পথে চলে যাই। আমি আর মাওলানা তফজ্জুল হক সাহেব এক সাথেই। তিনি আমায় হঠাৎ বললেন- " ঐ দেখ মদনী সাব, চলো মোসাফা করে আসি।" মাওলানা সৈয়দ আসআদ আল-মাদানীর কিছু রাজনৈতিক দর্শনের সাথে আমাদের যতই মতানৈক্য থাকুক কিন্তু তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা সর্বদাই আমাদের হৃদয়ের পাঁজড়ে লিখা আছে। বিশেষ করে গত আফগান-আমেরিকা যুদ্ধের সময় তাঁর যে সাহসী বক্তব্য আমি বিবিসি রেডিওতে শুনেছি তা

শ্রদ্ধাকে আরো বৃদ্ধি এবং দৃঢ় করে দিয়েছে। আমেরিকার বিরুদ্ধে তাঁর সাহসী বক্তব্য- ইঙ্গ-মার্কিন পণ্য বর্জনের আহ্বান, আবারো প্রমাণ করেছে তিনি দারুল উলূম দেওবন্দের প্রকৃত উত্তরসূরী-শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসানের আদর্শিক সন্তান এবং মাওলানা সৈয়দ হোসেন আহমদ মাদানীর যোগ্য প্রতিনিধি। আমি তাঁর সাথে মোলাকাতের উদ্দেশ্যে এগিয়ে গেলাম। তিনি তখন একাগ্রচিত্তে কোরআন পড়ছিলেন। আল্লাহর বান্দা আল্লাহর কালাম পড়ছেন আমি তাকে কিভাবে অন্য মনস্ক করি? আমার সাহস হলো না। পাশে বেশ কিছু সময় বসে অপেক্ষা করি। এক সময় তিনি কোরআন পড়তে পড়তেই দর্শনার্থীদের প্রতি হাত এগিয়ে দেন, সুযোগের সৎ ব্যবহার করে বিদায় হই। ঐদিন এশার নামাজ শেষে দেখা হয় লন্ডনের মুফতি সদর উদ্দিনের সাথে। মাওলানার সাথে আমার বেশ ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। তিনি আমায় নিয়ে গেলেন তার হোটেলে, এক সাথে খাওয়া-দাওয়া করে দীর্ঘ সময় তাঁর সাথে আলাপ হলো। মাওলানা এক সুযোগে আমায় জমিয়তুস শাবারের দাওয়াত দিলেন। ইংল্যান্ড ভিত্তিক জমিয়তুস সাবাব হলো জমিয়তে উলামার যুব সংগঠন। যেহেতু আমার রাজনীতি করার কোন অভিলাস নেই তাই শ্রদ্ধার সাথে মাওলানার প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করলাম। হজ্বের বিভিন্ন মাসআলা নিয়ে তাঁর সাথে আলোচনা হলো। বিশেষ করে বদলী উমরার ব্যাপারে। মাওলানার স্পষ্ট কথা কোন নফল ইবাদত বদলী হয় না। বদলী উমরার বিনিময় যারা টাকা রুজীতে ব্যস্ত তারা পাপ করছেন। মাওলানার বক্তব্যকে আমি খুব গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করলাম। মুফতি মাওলানা সদর উদ্দিন একজন যোগ্য আলেম- কিতাবের উপর তাঁর প্রচুর দখল আছে। তিনি ইংল্যান্ড থেকে টাইটেল দিয়ে ইফতা করেছেন দারুল উলূম দেওবন্দে এবং কোরআন-হাদিস-আরবীর উপর আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও ডিগ্রী নিয়েছেন। তাঁর বক্তব্যকে বাতাসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

৮ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার সকাল দশটায় জুম্মার উদ্দেশ্যে চলে গেলাম মসজিদে নববীতে। পা পা করে এগিয়ে গেলাম মিম্বরের কাছাকাছি। মানুষের প্রচন্ড ভীড়- সবাই যেন পারলে এই জায়গায় চলে আসতেন। দীর্ঘ অপেক্ষার পর আযান হলো, খতীব এসে মিম্বরে উঠলেন। শায়েখ আব্দুর রহমান হুজায়ফীকে আমি ইতিপূর্বে সরাসরি কিংবা ছবিতে দেখিনি। তাঁর অনেক বয়ান শুনেছি। বিশেষ করে তাঁর আমেরিকা-ইহুদী এবং শিয়াদের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক বয়ান খুব বেশি করে শোনা হয়েছে। এই বয়ানের কারণে তিনি বিশ্বব্যাপী খুব আলোচিত হয়েছেন, মজলুম মুসলমানদের শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। এই বয়ানের পর তিনি দীর্ঘদিন চাকুরীচ্যুত এবং গৃহবন্দী ছিলেন। এক প্রকারের নজর বন্দী এখনো আছেন। জুম্মার খুতবা দিতে যিনি দাঁড়িয়েছেন তাঁর কণ্ঠ আমার কাছে শায়েখ হুজায়ফীর মতো মনে হলো। ঐদিন আছরের নামাজে আমি আর হাফিজ সালেহ ছিলাম হযরত নবী করিম (সঃ) এর রওজার খুব কাছাকাছি। নামাজ শেষে বাবুস সালাম দিয়ে প্রবেশ করে মেহরাবের পিছনে প্রথম কাতারে গিয়ে দাঁড়াই-মাগরীবের নামাজ পর্যন্ত এখানে থেকেই কোরআন তেলাওয়াত করি। মাগরীব শেষে প্রথমে হযরত রাসুল (সঃ) এর উদ্দেশ্যে রওজার সামনে দাঁড়িয়ে দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করি। এরপর দু'কদম ডানে গিয়ে ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রাঃ) এর উদ্দেশ্যে সালাম জানাই। অতঃপর বেরিয়ে আসি। পাশের একটি হোটেলে চা নাস্তা করে আবার ফিরে আসি মসজিদে নববীর চত্বরে। বাবুস সালাম দিয়ে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হই, মানুষের প্রচন্ড ভীড়। আমরা মসজিদের কিবলার দিকের চত্বরে দাঁড়িয়ে কথা বলছি

এমনি সময় আমাদের পাশ দিয়ে মসজিদের ভেতর চলে গেলেন শায়েখ হুজায়ফী। সৌদী রাজতন্ত্রে আমেরিকার বিরুদ্ধে কথা বলা অনেক বড় অপরাধ। বর্তমান সউদ পরিবার সম্পূর্ণ আমেরিকার তাবেদার। উপসাগরীয় যুদ্ধে সউদী সরকার ইরাক আক্রমনে আমেরিকাকে সর্বাত্মক সহযোগীতা করে। ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনকে কোন ইসলামী মানুষ পছন্দ করে না সত্যি, কিন্তু ইয়াহুদী-খ্রীষ্টানরা ইরাকে আক্রমন করে মুসলমানদেরকে গণহারে হত্যা করুক তা কেউ মেনে নিতে পারে না। শায়েখ হুজায়ফীও তা মেনে নিতে পারেন নি। তিনি মসজিদে নববীর মিম্বরে বসে বিশ্বের ইহুদী-খ্রীষ্টান এবং শিয়া বিশেষ করে আমেরিকার বিরুদ্ধে খুব কঠোর সমালোচনা করতে গিয়ে সউদী সরকারের কোপানলে পড়েন। দীর্ঘদিন তিনি গৃহবন্দী এবং মসজিদে নববীতে খুতবা প্রদান থেকে বিরত ছিলেন। লোকমুখে শোনা যায় সউদী রাজপরিবারের অনেকে শায়েখ হুজায়ফীর ভক্ত থাকায় তাঁর উপর জুলুম-নির্যাতনের মাত্রা অনেকটা শীতল ছিল। সউদী সরকারের অনেক এমন ঘটনা আছে প্রতিবাদী আলেমকে হয়তো ক্বতল নতুবা গোপন কোথাও বন্দী করে নির্যাতন করার। বর্তমান সময়ের ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলে খ্যাত মক্কার বিশিষ্ট আলেম শায়েখ সফর আল-হাওয়ালী আমেরিকা কর্তৃক মুসলিম নির্যাতনের প্রতিবাদ করতে গিয়ে দীর্ঘদিন জেল-নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন।

আমি আর হাফেজ সালেহ সিদ্ধান্ত নিলাম শায়েখ হুজায়ফীর সাথে মোলাকাতের। এশার জামাত শেষে আমরা দু'জন এসে তাঁর যাতায়াতের পথে দাঁড়ালাম- এখানে আরো মানুষের ভীড়। পুলিশ বার বার চেষ্টা করছে ভীড় হ্রাসের। আমরা একটু দূরে দাঁড়ালাম। এক সময় শায়েখ হুজায়ফী বেরিয়ে এলেন। আমরা দু'জন এগিয়ে গেলাম, পুলিশ অনেককেই তাড়িয়ে দিচ্ছে, আমি বিস্মিত হলাম পুলিশ আমাকে তাড়াচ্ছে না দেখে। আমার গায়ে আরবী পোশাক থাকায় হয়তো পুলিশ বিভ্রান্ত হচ্ছে. অথবা এটা আল্লাহর অনুগ্রহ। আমি কার পার্ক পর্যন্ত শায়খের সাথে যেতে যেতে প্রথমে সালাম দিলাম- আসসালামু আলাইকুম ইয়া ইমামুল মদিনা- আহলান সাহলান ইয়া সাইয়্যেদুল উম্মাহ।

তিনি সালামের উত্তর দিলে আমি জানতে চাইলাম- কাইফা হালোকা ইয়া শায়েখ?

ছোট একটি শব্দ উচ্চারিত হলো- আল-হামদুলিল্লাহ। আমি আবার উচ্চারণ করলাম- ইয়া শায়েখ, আফদানী কালামুকা। আনা শাকিরু হামতোকা। অর্থাৎ তোমার বক্তব্য আমাকে উপকৃত করেছে। আমি তোমার সাহসের কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী।

তিনি নিঃশব্দ আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। তাঁর চোখ দু'টো আমাকে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলো অনেক অসহায়ত্বের কথা। আমি হাড়ে হাড়ে কষ্ট অনুভব করলাম। তিনি হাত উঠিয়ে বিদায় নিয়ে কার পার্কের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমি প্রার্থনা করলাম- হে আল্লাহ তুমি মক্কা-মদিনাসহ গোটা মুসলিম বিশ্বকে ইহুদী-খৃষ্টান-মুনাফেকদের কব্জা থেকে রক্ষা কর।

জানাজায় দু'দিকে সালাম ফিরানো প্রসঙ্গ :

মসজিদুল হারাম কিংবা মসজিদুল নববীতে প্রায় প্রতি ওয়াক্তেই দু'চারটা জানাজা থাকে। একদিন আসরের নামাজ শেষে জানাজা পড়ে ফিরতে গিয়ে দেখি এক আরব যুবক একজন বাংলাদেশী যুবককে ধমকাচ্ছেন। ব্যাপারটি বুঝার জন্য একটু কর্ণপাত করলাম। সমস্যা

হলো জানাজার নামাজে দু'দিকের সালাম ফিরানো নিয়ে। হানাফী ফেকাহ্ অনুযায়ী জানাজার নামাজে দু'দিকে সালাম ফিরাতে হয়। পাক-ভারত-বাংলাদেশের বেশির ভাগ মুসলমান হানাফী ফেকাহের অনুসারী। বাংলাদেশী যুবকটি জানাজার নামাজে দু'দিকে সালাম ফিরাতেই পাশে দাঁড়ানো আরব যুবকটি ক্ষুব্ধ হয়ে ধমক দিয়ে বলতে লাগলো- "ইয়া হাজ্জী, হাজা বিদা'হ।" বাংলাদেশী যুবকটি ব্যাপার বুঝতে না পেরে প্রায় কিংকর্তব্যবিমূঢ়। আমি একটু এগিয়ে আরব যুবকটিকে একটু কটাক্ষ করেই বললাম- ইয়া রফিক, মা মা'না বিদা'হ? ক্বা'লা ইমামুল ফিক্হ সাইয়্যেদুনা আবু হানিফা (দু'দিকে মাথা ঘুরিয়ে বললাম) হাজা সুন্নাহ। অর্থাৎ হে বন্ধু, বিদ'আত কি? ইমাম আবু হানিফা বলেছেন- এটাই সুন্নত।

আমার কথা শুনে যুবকটি তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলো। যুবকটি'র বক্তব্য থেকেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম সে "আহলে হাদিস" গ্রুপের সাথে সম্পর্কিত। ইংল্যান্ডে আমার বেশ কিছু বন্ধু-বান্ধব আছে যারা এই গ্রুপের সাথে সম্পর্ক রাখে। বিভিন্ন ব্যাপার নিয়ে মাঝে মধ্যে তাদের সাথে আমার আলোচনা হয়। এই গ্রুপটির উত্তান মূলত শায়েখ আলবানী (রঃ) থেকে। তাদের দৃষ্টিতে আমল হতে হবে শুধু কোরআন-হাদিসের শাব্দিক অর্থ অনুযায়ী- কোন প্রকার ইসতেলাহী অর্থ গ্রহণ যোগ্য নয়। শায়েখ আলবানী যে সব হাদিসকে জ'ইফ বা অসহীহ বলেছেন তাদের দৃষ্টিতে এই সব হাদিসের উপর আমল করা বিদ'আত। এই গ্রুপটির মূল কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে তৌহিদ সম্পর্কে মানুষের ধারণাকে স্পষ্ট করা এবং বিদ'আত- শিরক সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা। মূল কর্মসূচীর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কারো দ্বিমত থাকার কথা নয়। দ্বিমতটা হচ্ছে তাদের বিদ'আত-শিরক সম্পর্কিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নিয়ে। এই গ্রুপটির সূচনা আরবের সংস্কার আন্দোলনের নেতা শায়েখ আব্দুল ওয়াহাব নজদীর হাতে হলেও আব্দুল ওয়াহাব নজদীর বিপ্লবী আদর্শ তাদের মধ্যে প্রস্ফুটিত দেখা যায় না। বর্তমান সৌদি রাজতন্ত্রের সাথে এই গ্রুপটির সম্পর্ক ঐতিহাসিক। এখনো তাদের সকল কর্মসূচী বাস্তবায়িত হয় সৌদির রাজাদের অর্থে। তারা বিশ্বব্যাপী বিদ'আত-শিরকের বিরুদ্ধে কথা বললেও মক্কা-মদিনাসহ মুসলিম বিশ্ব যে বিদ'আত-শিরকের জনকদের শৃংখলে আবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে সে সম্পর্কে নিরব। বরং যারা রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক বিদ'আত-শিরকের বিরুদ্ধে কথা বলেন তারা ওদের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়ে অপপ্রচার করে থাকেন।

তারা উসামা বিন লাদেনের বিরুদ্ধে ফতোয়া লিখে বিভিন্ন ভাষায় বই আকারে প্রকাশ করে ফ্রি বিতরণ করেছেন। তাদের দৃষ্টিতে মুসলিম বাদশা জালেম কিংবা ফাসেকও যদি হয় তবু তার বিরুদ্ধে কথা বলা জায়েজ হবে না। ফেকাহের প্রধান ইমামদের মধ্যে তারা সবচাইতে কটাক্ষ করে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) কে। এই বিরোধীতার বিশেষ কিছু কারণের মধ্যে হয়তো এটিও একটি যে, ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) জালেম সরকার মুনতাসিম বিল্লাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ফলে রাজবন্দী হিসেবে শাহাদাত বরন করেছিলেন। আরব যুবকটি আমার মুখে ইমাম আবু হানিফার নাম শুনে বলে উঠলো- "ইমামুকা ওয়া'ফাহুল্লাহ। মা আলিমু আবু হানিফা। অর্থাৎ আল্লাহ তোমার ইমামকে ক্ষমা করুন। আবু হানিফা কোন আলেম নয়।" ওদের মুখে এই সব কথা শুনে শুনে আমি অভ্যস্ত তবু আমি তাকে উত্তরে বললাম- 'ইয়া আইয়ূহাত তালিবুল ইলম, কাম কিতাবা তালআতুহু? আকালু- আবু হানিফা আরজিহ মিন শায়েখ আলবানী, আব্দুল ওয়াহাব নজদী, বিন বায,

ওয়া গায়রুহু। অর্থাৎ হে জ্ঞান অন্বেষণকারী, কতটা বই অধ্যয়ন করেছো? আবু হানিফার জ্ঞান শায়েখ আলবানী, আব্দুল ওয়াহাব নজদী, বিন বায প্রমুখের থেকে বেশি।' আমার উত্তর শুনে যুবকটি ক্ষুদ্ধতার সাথে প্রস্থান করে চলে গেলো। আমি ভাবছি মসজিদে নববীর সামনে দাঁড়িয়ে আজকের বিশ্ব মুসলিমের মর্মান্তিক অবস্থার কথা- ভাবছি যারা ছোট ছোট বিষয় নিয়ে, ব্যক্তিগত কিংবা রাজনৈতিক স্বার্থে ফেতনা সৃষ্টি করে মুসলমানদেরকে বিভক্ত করেন তাদের কথা। আমাদের করার কি ছিলো আর আমরা করছি কি?

রক্তাক্ত ওহোদ :

সাত ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার। মসজিদে নববীতে ফজরের নামাজ পড়লাম, নাস্তা শেষে রুমে ফিরলাম। সকাল আটটার দিকে বেরিয়ে গেলাম মদিনার বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান গুলো জিয়ারতের উদ্দেশ্যে। ''তারিখে আবু জার'' অর্থাৎ আবু জার রোড দিয়ে আমাদের গাড়ীটি ময়দানে ওহোদের দিকে যাচ্ছে আর আমি ভাবছি হযরত রাসুল (সঃ) এর বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু জর গিফারী (রাঃ)'র কথা।

ইসলাম পূর্ব সময়েও তিনি তাওহীদবাদী উন্নত চরিত্রের অধিকারী জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের কৌশলগত কারণে তাকে গোপনে নিজ গোত্রের কাছে ফিরে যেতে অনুরোধ করা হয়েছিলো, কিন্তু ইসলামের মতো সত্যকে ধারণ করে তিনি নিরব-নিঃশব্দে মক্কা থেকে বেরুতে পারলেন না- কা'বার সামনে দাঁড়িয়ে উচ্চঃস্বরে তাওহীদ এবং রিসালাতের সাক্ষ্য দিতে শুরু করলেন। কোরেশরা তাঁর উপর আক্রমণ করলে হযরত রাসুল (সঃ) এর চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ) এই বলে তাঁকে রক্ষা করেছিলেন- ''হে আমার জাতি তোমরা এটা কি করছো? এ যে গিফার কবিলার লোক। তোমরা ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য যে পথে সিরিয়া যাও গিফার কবিলার অবস্থান এই পথিপার্শ্বে।'' তারা যদি তোমাদের যাতায়াত বন্ধ করে দেয়? হযরত আব্বাস (রাঃ) তখনও মুসলমান হননি, তাঁর কথায় কাজ হলো। কোরায়েশরা আবুজর কে ছেড়ে দিলে তিনি ফিরে আসেন নিজ এলাকায়। তাঁর দাওয়াতে গিফার গোত্র এবং আসলাম গোত্রের প্রচুর লোক এই সময় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আবুজর গিফারী (রাঃ) একজন দার্শনিক ছিলেন। তাঁর একটি প্রধান দর্শন ছিলো প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ কারো কাছে থাকা অনুচিৎ। কালমার্ক্সের অর্থনৈতিক চিন্তার মূল উৎস অনেকের ধারণা আবুজর গিফারী (রাঃ) থেকে। অনেক মুসলিম অঞ্চলে কমিউনিষ্টরা এ কথার বহুল প্রচার ঘটিয়েছেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে যদিও এই বক্তব্যের সত্যতা দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু আবুজর গিফারীর চিন্তাধারার সাথে কালমার্ক্সের চিন্তাধারার অনেক ব্যবধান রয়েছে। এক যুদ্ধ যাত্রায় হযরত আবুজর গিফারী (রাঃ) মূল দল থেকে বেশ পিছনে অদৃশ্য থেকে যাওয়ায় অনেকে বলতে লাগলেন- আবুজর পালিয়ে মদিনায় ফিরে গেছেন। হযরত রাসুল (সঃ) এর কান পর্যন্ত একথা পৌঁছে যায়। সেই সময়ে জিহাদ থেকে দুরে থাকাকে মুনাফেকীর লক্ষণ বলে সবাই বিশ্বাস করতেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে দেখা গেলো হযরত আবুজর গিফারী (রাঃ) বয়স জনিত কারণে খুব আস্তে আস্তে হেঁটে মূল দলের সাথে এসে মিশলেন। হযরত রাসুল (সঃ) কৌতুক করে বললেন- ''আবুজর বেহেস্তেও একা একা প্রবেশ করবে।'' বাস্তবিক দেখা গেলো হযরত রাসুল (সঃ) এর ইন্তেকালের পর হযরত আবুজর গিফারী (রাঃ) তাঁর দার্শনিক চিন্তা-ভাবনার ফলে মদিনার গণবসতি থেকে বেশ দূরে

চলে গেলেন এবং সেখানেই ইন্তেকাল করেন। তারিকে আবুজর এসে মিলিত হয়েছে তারিকে ওহোদের সাথে। মসজিদে নববী থেকে ওহোদের পাহাড় প্রায় তিন-চার কিলোমিটার দূরে। আমাদের গাড়ীটি এসে থামলো ময়দানে ওহোদের পার্শ্ববর্তী একটি পাহাড়ের পাদদেশে। আমার তন-মন কেমন জানি এলোমেলো হতে শুরু করলো। এটা সেই ময়দান যেখানে আব্দুল্লাহ ইবনে কুমাইয়ার তরবারীর আঘাতে আল্লাহর হাবীব রাহমাতুল্লিল আ'লামীন (সঃ) রক্তাক্ত হয়েছিলেন এবং তাঁর দুটি দাঁত শহীদ হয়েছিলো। রাসুল প্রেমের সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ সৃষ্টি করেছিলেন এই ময়দানে হযরত আবু দাজানা (রাঃ) কাফেরদের তীর-বল্লমের আঘাত থেকে হযরত রাসুল (সঃ) কে রক্ষার্থে নিজ পিঠকে ঢাল বানিয়ে, হযরত তালহা (রাঃ) হযরত রাসুল (সঃ) কে তলোয়ারের আঘাত থেকে রক্ষা করতে গিয়ে নিজের হাত কোরবান করেন। মহিলা সাহাবী হযরত উম্মে আম্মারা (রাঃ) রাসুল (সঃ) কে শত্রুর আঘাত থেকে বাঁচাতে নিজে আহত হয়ে। মক্কার অতি সম্পদশালী এবং প্রভাবশালী ব্যক্তি উমায়েরের বিলাস বসনে বড় হওয়া সন্তান মুস'আব এক সময় মুসলমান হয়ে গেলে তাঁর পিতা তাকে ত্যাজ্য করে দেন- তিনি অতি সাধারণ জীবন ধারণ করেন। হযরত মুস'আব (রাঃ) এর চেহারা অনেকটা রাসুল (সঃ) এর মতো ছিলো। ওহোদের যুদ্ধে তাঁর হাতে ইসলামের পতাকা ছিলো। হযরত মুস'আব (রাঃ) শহীদ হলে কোরায়েশরা ভাবলো হযরত রাসুল (সঃ) শহীদ হয়ে গেছেন। তারা তা প্রচারও করেছিলো। হযরত আনাস (রাঃ) এর চাচা হযরত ইবনে নযর (রাঃ) এই সংবাদে দারুণ মর্মাহত হয়ে ঘোষণা করেছিলেন- "যে পৃথিবীতে রাসুল (সঃ) নেই সেখানে আমি থাকার কি অর্থ? তিনি লড়াই করতে করতে শত্রুদের ভীড়ে হারিয়ে গেলেন। যুদ্ধ শেষে দেখা গেলো তিনি শহীদ হয়ে গেছেন এবং তাঁর শরীরে তলোয়ার-বল্লম-তীরের প্রায় আশিটি আঘাত রয়েছে।

ওহোদ'তো এই ময়দান যেখানে হযরত ইবনে ওয়াক্কাসের তীর নিক্ষেপ দেখে স্বয়ং রাসুল (সঃ) বলে উঠেছিলেন- "হে ইবনে ওয়াক্কাস, তীর চালাও। তোমার উপর আমার পিতা-মাতা উৎসর্গ হোক।" (বোখারী)।

ওহোদ'তো এই ময়দান যেখানে মুসলমানদের পরাজয়ের সংবাদে দৌড়ে এসেছিলেন শিশু সাহাবী হযরত সাবেত (রাঃ) এবং কাফেরদের মোকাবেলা করতে করতে শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন।

ওহোদের সর্বাধিক মর্মান্তিক ঘটনা হযরত হামজা ইবনে আব্দুল মোত্তালিবের শাহাদত। হিন্দার গোলাম ওয়াহশীর "হারবা" নামী আবিসিনীয়দের একটি অস্ত্রের আঘাতে তিনি শাহাদত বরণ করেছিলেন। হিন্দা হযরত হামজা (রাঃ) এর লাশের উপর বসে পেট চিরে কলিজা বের করে চিবিয়ে ছিলো।

সাইয়্যেদুনা হযরত হামজা (রাঃ) ছিলেন হযরত রাসুল (সঃ) এর অতি প্রিয় চাচা- দূর সম্পর্কের খালাতো ভাই এবং বাল্যবন্ধু। তিনি নবুয়্যতের ষষ্ঠ বছরে ইসলাম গ্রহন করলেও ইতিপূর্বে কোনদিন মোহাম্মদের শত্রুদের সাথে আপোষ করেননি। কা'বার পার্শ্ববর্তী আস-সাফা দিয়ে যেতে যেতে একদিন আবু জেহেল হযরত রাসুল (সঃ) কে অপমান করেছিলো। হামজা শিকার থেকে ফিরে একজন গোলামের কাছে এই সংবাদ শোনে দ্রুত কা'বা চত্বরে চলে যান যেখানে স্বদলে আবু জেহেল বসা ছিলো। আবু জেহেলের শরীরে ধনুক লাগিয়ে

বললেন- "যদি আমি মোহাম্মদের দ্বীন গ্রহণ করি তবে কি তুমি আমাকেও অপমান করবে? আমি তোমায় আঘাত করলাম সাহস থাকলে আমায় আঘাত করো।"

মক্কার জমিনে সেদিন আবু জেহেলের সাহস হয়নি হামজাকে কিছু বলার। না, সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে হামজার সাথে লড়াই করার মতো সাহস ওহোদের ময়দানেও কারো ছিলো না। ওয়াহশী'তো আঘাত করেছিলো গোপন অবস্থান থেকে। ওহোদের যুদ্ধে সর্বমোট সত্তরজন সাহাবী শহীদ হয়েছিলেন। হযরত রাসুল (সঃ) এই সত্তরজনের দাফন শেষে জাতির উদ্দেশ্যে এক বক্তব্যে বলেছিলেন- হে মুসলিম জাতি, তোমাদের প্রতি এমন ভয় আর নেই যে তোমরা মুশরিক হয়ে যাবে। তবে ভয় আছে তোমরা যদি আবার দুনিয়ার মহব্বতে ডুবে যাও।" (সহীহ বোখারী)। অন্য এক হাদীসে আছে 'একদিন মহানবী (সাঃ) সাহাবাদের বললেন, এমন একদিন আসবে যেদিন কাফেররা মুসলমানকে হত্যা করতে একে অন্যকে এভাবে ডাকবে যেভাবে তোমরা একে অন্যকে দস্তরখানায় ডাকো। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, সে সময় কি মুসলমানের সংখ্যা কম হবে? রাসুল (সাঃ) বললেন, না, সেদিন মুসলমানের সংখ্যা তোমাদের থেকে বেশী হবে। সাহাবারা আশ্চর্য হয়ে জানতে চাইলেন, তাহলে কারণ কি? রাসুল (সাঃ) বললেন, তাদের একটা অসুখ হবে, সাহাবারা জানতে চাইলেন সে অসুখ কি? রাসুল (সাঃ) বললেন- হুব্বুদ্দুনিয়া কারাহিয়াতুল মউত। অর্থাৎ দুনিয়ার মহব্বত এবং মৃত্যুর ভয়। আজকের বিশ্বে চোখ দিলে হযরত রাসুল(সঃ)এর হাদিসের বাস্তবতা স্পষ্ট দেখা যায়।

যে পাহাড়ের পাদদেশে আমাদের গাড়ী থেমেছে আমরা প্রথমে তার চূড়ায় উঠি এবং আমি ভাবিত হই আজকের মুসলিম বিশ্বের অবস্থা আর হযরত রাসুল (সঃ) এর ময়দানে ওহোদে দেওয়া বক্তব্য নিয়ে। আজকে আমরা মুশরিক নয় বটে কিন্তু দুনিয়ার মহব্বত আমাদের ঠিক-ই গ্রাস করে নিয়েছে। আমরা যে পাহাড়ের চূড়ায় উঠেছি তা ঐ পাহাড় যেখানের পাহারাদারী ছেড়ে দেওয়ার কারণে ওহোদের যুদ্ধে বিপর্যয় নেমে এসেছিলো। পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে আমি এক নজরে দেখে নিলাম যুদ্ধের ময়দানে হযরত রাসুল (সঃ) এর কামান্ডিং কত দূরদর্শী ছিলো। চারিদিকে হাজার হাজার হাজীদের ভীড়। আমরা পাহাড় থেকে নেমে শুহাদায়ে ওহোদের কবরস্থান জিয়ারতে গেলাম। এখানে সাইয়্যেদুস শুহাদা হযরত হামজা (রাঃ) এরও কবর। কবর স্থানের চারিদিকে দেয়াল ঘেরা, ভেতর একটা মাঠের মতো, কার কবর কোনটি তার কোন চিহ্ন নেই। সমস্ত কবরগাহ কে মানুষ "রওজা-এ-হামজা" বলে থাকেন।

শুহাদাদের কবর জিয়ারত শেষে ড্রাইভার একটি বস্তির আকাবাকা পথে গাড়ী চালালো। ড্রাইভার বাংলাদেশী। জানতে চাইলাম আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি? জানালেন- সবাইতো দূর থেকে ওহোদ পাহাড় দেখে চলে যান, চলুন একটু কাছে গিয়ে দেখা যাক।

আমরা গ্রামের পথ দিয়ে ওহোদ পাহাড়ের একেবারে পাদদেশে চলে যাই। ড্রাইভার ডান হাতের শাহাদত আঙ্গুল উঠিয়ে বললেন- এটা ঐ গুহা যেখানে ওহোদের যুদ্ধে বিপর্যয়ের পর হযরত রাসুল (সঃ) রক্তাক্ত হয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি হঠাৎ মনে হলো হয়তো কোরায়েশ সর্দার আবু সুফিয়ান এখানেই দাঁড়িয়ে চিৎকার করে জানতে চেয়েছিলো- মোহাম্মদ কি এখানে আছেন?
কোন উত্তর না পেয়ে আবার প্রশ্ন করেছিলো- আবু বকর, ওমর কি আছেন?

আবারো কোন উত্তর না পেয়ে ঘোষণা করেছিলো- ওরা সবাই তাহলে মরে গেছে। আবু সুফিয়ানের ঘোষণা শুনে হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেলে তিনি এই গুহা থেকে হুঙ্কার দিয়েছিলেন- রে আল্লাহর দুশমন, আমরা সবাই জীবিত আছি।

আবু সুফিয়ান তখন বলেছিলো- "আলা হোবল" অর্থাৎ হোবল সর্বশ্রেষ্ঠ। হযরত রাসুল (সঃ) হযরতে সাহাবায়ে কেরামদের কে বললেন- ঘোষণা করে দাও- আল্লাহ আ'লা ওয়া জাল্লা। অর্থাৎ আল্লাহ সর্বোচ্চ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ।

আবু সুফিয়ান এ ঘোষণা শুনে আবার বলে উঠলো "লানাল উযযা ওয়ালা উযযা লাকুম" অর্থাৎ আমাদের জন্য উযযা আছে তোমাদের উযযা নেই। হযরত রাসুল (সঃ) সাহাবাদেরকে বললেন- ঘোষণা করে দাও- "আল্লাহ মাওলানা ওয়ালা মাওলা লাকুম" অর্থাৎ আমাদের প্রভু আল্লাহ তোমাদের কোন প্রভু নেই।

সিলআ'র পাদদেশে :

ইহুদী সম্প্রদায়ের ইতিহাসটা সর্বদাই নির্বাসিতের, উশৃংঙ্খলতার, মুনাফাখুরীর। এই জাতির সংশোধনীর উদ্দেশ্যে তাদের মধ্যেই অসংখ্য নবী এসেছেন। ওরা সংশোধিত হওয়া দূরের কথা উল্টো নবী-রাসুলগণ তাদের কর্তৃক নির্যাতিত হয়েছেন- শহীদ হয়েছেন। ইসলাম পূর্ব সময়ে ফিলিস্তিন থেকে নির্বাসিত একদল ইহুদী মদিনায় এসে বসতি শুরু করেছিলো। মদিনার মানুষ প্রকৃতিগতভাবে সহজ-সরল। ইহুদীরা তাদের কূটকৌশলে এই মানুষগুলোর উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক দিকে। মদিনার অধিকাংশ মানুষ ইহুদীদের সূদী ঋণে জর্জরিত থাকায় তাদের মধ্যে ইহুদীদের বিরুদ্ধে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির সুযোগই ছিলো না। মুষ্টিমেয় কিছু ইহুদী গোটা মদিনাকে নিয়ন্ত্রণ করে নিয়েছিলো। মদিনায় যখন ইসলামের প্রসার ঘটে এবং হযরত নবী করিম (সঃ) হিজরত করে মদিনায় গিয়ে স্থায়ী বসতি শুরু করেন। তখনই ইহুদীদের নিয়ন্ত্রণ হ্রাস পেতে থাকে। ইহুদীদের স্বভাবই হলো সামনা-সামনি নয়, গোপন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বিশৃংখলা সৃষ্টি করা। তারা কোন দিন হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর প্রকাশ্য বিরোধীতা করেনি। মদিনায় গিয়েই হযরত নবী করিম (সঃ) ইহুদীদের সাথে শান্তি চুক্তি করে নিয়েছিলেন। সেই চুক্তিতে সাতটি শর্তের কথা আমরা ইতিহাসে দেখতে পাই

১) রক্ত বিনিময় পূর্বের ন্যায় বহাল থাকবে।

২) ইহুদীরা স্বাধীনভাবে নিজেদের ধর্মকর্ম করতে পারবে, কেউ কারো ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবে না।

৩) ইহুদী ও মুসলমান পরস্পর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখবে।

৪) ইহুদী কিংবা মুসলমান কোন শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হলে উভয়ে মিলে আক্রমণ প্রতিহত করবে।

৫) কোরাইশদেরকে কেউ আশ্রয় দিবে না।

৬) মদিনা আক্রান্ত হলে, উভয়ে মিলে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থে লড়াই করবে।

৭) কোন শত্রুর সাথে এক পক্ষ সন্ধি করলে অপর পক্ষ সন্ধি মেনে চলবে। কিন্তু ধর্মীয় যুদ্ধের ক্ষেত্রে এ শর্ত প্রযোজ্য হবে না। (সিরাতে ইবনে হিশাম)

বনু নাযীর গোত্রের ইহুদীরা আমের গোত্রের দু'জন মুসলমানকে হত্যার পর চুক্তির নিয়মানুসারে রক্তপণ পরিশোধ না করায় হযরত রাসুল (সঃ) তাদের সাথে আলোচনা করতে বনু নাযীরদের বস্তিতে গেলেন। বনু নাযীর ইহুদীরা এই সময় দু'মুখী নীতি অবলম্বন করে। তারা এক দিকে রক্তপণ দিতে রাজী হয়ে যায় অন্য দিকে গোপন ষড়যন্ত্র করে ছাদের উপর থেকে পাথর ছুঁড়ে হযরত রাসুল (সঃ) কে হত্যার। আমর ইবনে জাহশ নামী এক ইহুদী এই অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে দেয়ালের উপরও উঠেছিলো। কিন্তু হযরত রাসুল (সঃ) আল্লাহ কর্তৃক ইহুদীদের এই কুমতলবের সংবাদ পেয়ে মদিনায় ফিরে আসেন। এরপর তারা বিভিন্ন ভাবে আরো কিছু ষড়যন্ত্র করলো। হযরত নবী করিম (সঃ) বনু নাযীরের ইহুদীদেরকে নির্দেশ দিলেন মদিনা ছেড়ে চলে যেতে এবং তিনি নিজে সেনাপতির দায়িত্ব নিয়ে বনু নাযীরদের দূর্গ পনেরো দিন অবরোধ রেখে তাদেরকে বাধ্য করেন মদিনা ছেড়ে যেতে। মদিনা ছেড়ে ওরা খায়বারে আশ্রয় নিয়েছিলো এবং সেখানে বসে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে লাগলো।

মদিনা থেকে নির্বাসিত বনু নাযীর গোত্রের ইহুদী সর্দার সালাম ইবনে আবিল হুকাইক, হুয়াই ইবনে আবতাব, কিনানা ইবনে রবী মক্কায় গিয়ে কোরাইশদেরকে বললো- "তোমরা সাহায্য করলে আমরা মুসলমানদের অস্তিত্ব মাটির সাথে মিশিয়ে দিবো।"কোরাইশরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে এমনি নাচনী বুড়ী, এর মধ্যে বনু নাযীরদের হাতের তালি। কোরাইশ-বনু নাযীরদের মধ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঐক্য হয়ে গেলো। এরপর ওরা উভয় গোত্র মিলে তাদের ঐক্যে নিয়ে এলো গাফতীন, বনু আসাদ, বনু গোলাইমান, বনু সাদ ইত্যাদি আরবের অন্যান্য গোত্রদ্বয়কে। তারা সম্মিলিত ভাবে সিদ্ধান্ত নিলো মদিনা আক্রমণের। মদিনার অবস্থা থমথমে। হযরত নবী করিম (সঃ) অবস্থার মোকাবেলার জন্য জরুরী বৈঠক ডাকলেন। বিশিষ্ট সাহাবীদের পরামর্শ নিলেন। হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) পরামর্শ দিলেন- "যেহেতু সম্মিলিত বাহিনীর সাথে সামনা-সামনি মোকাবেলাা করার মতো সামর্থ নব-গঠিত মদিনা রাষ্ট্রের এখনো অর্জিত হয়নি তাই যেদিক থেকে আক্রমণের সম্ভাবনা বেশি সেদিকে পরিখা খনন করে একটু নিরাপদ স্থানে দাঁড়িয়ে আমরা শত্রুর মোকাবেলা করতে পারি।" (সীরাতুন নবী)

হযরত নবী করিম (সঃ) হযরত সালমান ফারসীর মতামতকে গ্রহন করে "সিলআ" নামক পাহাড়ের চারিদিকে পরিখা খনন করে দেন। উল্লেখ্য যে, তৎকালীন মদিনা তিন দিক ছিলো ঘর-বাড়ী আর খেঁজুর বাগানে বেষ্টিত শুধু জবলে সিলআ'র দিক ছাড়া। আরবের সম্মিলিত কাফের শক্তি আবু সুফিয়ান ইবনে হারবের নেতৃত্বে দশ হাজার সৈন্য নিয়ে জবলে সিলআ'র পাদদেশে এসে সেদিন পরিখা দেখে কিংকর্তব্য বিমূঢ় এবং আশ্চর্য হয়েছিলো। সাহস করে দু'চারজন পরিখা অতিক্রম করতে চাইলে নিরাপদ আশ্রয় থেকে মুসলিম সৈন্যরা তাদেরকে তীর-বল্লম নিক্ষেপ করে তাড়িয়ে দিয়েছিলো। শেষ পর্যন্ত সম্মিলিত কাফের বাহিনী হতাশ হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। ইতিহাসে এই যুদ্ধকে পরিখা বা খন্দকের যুদ্ধ বলে পরিচিতি দেওয়া হয়েছে। ওহোদ থেকে বেরিয়ে বাদশা ফাহদ রোড হয়ে আমরা আসি খন্দকের যুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত সিলআ পাহাড়ের পাদদেশে। না, এখানে খন্দকের কোন চিহ্ন অবশিষ্ট নেই। সৌদির রাজতান্ত্রিক সরকারের নিত্য-নতুন সংস্কার কর্মসূচী মক্কা-মদিনার অন্যান্য ইসলামী ঐতিহ্য গুলোর মতো খন্দকের ঐতিহ্যকেও ধ্বংস করে দিয়েছে।

কর্তৃপক্ষের বক্তব্য হলো যে সকল জিনিস থেকে বিদ'আতের উৎপত্তি হয় সেগুলো ধ্বংস করা হচ্ছে বিদ'আত নির্মূলের লক্ষ্যে। আমরা বিষয়টাকে সমর্থন করলাম যেহেতু "কুল্লু বিদ'আতিন দালালা, কুল্লু দালালিন ফিন-নার" অর্থাৎ প্রত্যেক বিদ'আত ভ্রষ্টতা আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতা জাহান্নামী। কিন্তু এখানে আমাদের দু'টি কথা আছে। প্রথম কথা হলো- ঐতিহ্যের সংরক্ষণ আর বিদ'আত এক জিনিস নয়।

দ্বিতীয় কথা হলো- মক্কা, মদিনার মতো পবিত্র শহর গুলোতে স্যাটেলাইট টিভির যে ব্যাপক সয়লাব তা অবশ্যই ঐতিহ্য সংশ্লিষ্ট বিদ'আত থেকে জঘন্য পাপ। যারা বিদ'আতের বিরুদ্ধে এত দৃঢ় তারা এ ব্যাপারে নিরব দর্শক কেন? এ ব্যাপারে সৌদি উলামাদের নিরবতা আমাকে ভাবিত করে। মদিনা থেকে মক্কা আসার পথে একজন টেক্সি ড্রাইভারের কাছে জানতে চাইলে তিনি জানালেন, "প্রতিবাদী আলেম সমাজ তো জেলে কিংবা ঘরে বন্দী। যারা মুক্ত আছেন তারা মানসিকভাবে সৌদি সরকারের অর্থের দাস।" টেক্সি ড্রাইভার আমাকে আরো জানালেন- প্রথম দিকে সর্বস্তরের উলামারা স্যাটেলাইট টি.ভি'র বিরুদ্ধে কথা বললে সরকার বন্ধ করে দিয়েছিলো কিন্তু আমেরিকার প্রতিবাদের মুখে সৌদি সরকার আবার তা চালু করে দেয়।

ঐতিহ্যের অবশিষ্ট নিদর্শন সমূহ দেখতে দেখতে এক সময় পৌঁছে গেলাম সিলাআ পাহাড়ের কিনারের মসজিদে ফাতাহএ। এখানে দাঁড়িয়ে হযরত নবী করিম (সঃ) খন্দক যুদ্ধের সময় আল্লাহর কাছে বিজয়ের প্রার্থনা করেছিলেন। একটা প্রশ্ন প্রায় অনেকে করে থাকেন বর্তমান মুসলিম উম্মাহর মর্মান্তিক অবস্থা দেখে যে, আল্লাহ কেন দোয়া কবুল করছেন না? মসজিদে ফাতাহ এর সামনে দাঁড়িয়ে এই প্রশ্নের উত্তর পেলাম।

এখানে ঐতিহ্যের স্মৃতি বিজড়িত আরো আছে মসজিদে সালমান ফারসী, মসজিদে আলী, মসজিদে আবু বকর (রাঃ)। এই মসজিদ গুলো তুর্কি খিলাফতের সময় নির্মাণ করা হয়েছিলো। সৌদি-তুর্কি জাতীয়তাবাদী সংঘাতের পর সৌদি সরকার তুর্কি আমলের অনেক কিছুর মতো এই মসজিদ গুলোর প্রতিও অবহেলা দেখায়। ফলে এগুলো ধ্বংসের মুখে।

মসজিদে কিবলাতাইন :

ওয়াদী আল-আকিক এবং খালেদ বিন ওয়ালিদ রোডের পাশেই মসজিদে কিবলাতাইন। এই মসজিদে জোহরের নামাজ আদায়ের সময় বায়তুল মোকাদ্দস থেকে কা'বার দিকে কেবলা পরিবর্তনের নির্দেশ এসেছিলো। বর্তমান মসজিদটি ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দে বাদশা ফাহাদ কর্তৃক নির্মিত এবং এতে দু'হাজার মুসল্লির স্থান সংকুলান হয়।

আমরা সিলআ পাহাড়ের পাদদেশ থেকে মসজিদে কিবলাতাইনে এসে দু'রাকাত নফল নামাজ পড়ি। নতুন তৈরী মসজিদটি দেখতে চমৎকার, দেয়ালে সাদা রঙ, প্রধান সড়কের দরজার উপরে দু'পাশে দু'টি মিনার এবং ছাদে দু'তিনটি গম্বুজ।

মসজিদে কো'বা :

মসজিদে কিবলাতাইন থেকে বেরিয়ে আমরা আসি মসজিদে কো'বায়। এটা হলো মদিনার প্রথম মসজিদ। যা হযরত সাহাবায়ে কেরামদের কে নিয়ে স্বয়ং হযরত নবী করিম (সঃ)

নির্মাণ করেছিলেন। হযরত নবী করিম (সঃ) বলেন- মসজিদে কো'বায় এক ওয়াক্ত নামাজ এক উমরার সমতুল্য। (তিরমিযী)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন- হযরত নবী করিম (সঃ) মসজিদে কো'বায় নিয়মিত যাতায়াত করতেন- কখনো সোয়ারীতে হয়ে, কখনো পায়ে হেঁটে। সেখানে দু'রাকাত নামাজ পড়তেন। (বোখারী-মুসলিম)

মসজিদে কো'বা বর্তমানে এক বিশাল মসজিদ। ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে বাদশা ফাহাদ যে সম্প্রসারণের ভিত্তিপ্রস্তর করেছিলেন এতে- মসজিদের সীমানা এতটুকু পৌঁছেছে যে বিশ হাজার মুসল্লী এক সাথে জামাতে নামাজ পড়তে পারেন। আমরা এখানে দু'রাকাত নামাজ পড়লাম।

মসজিদে জুম্মাহ :

মসজিদে কো'বা থেকে আনুমানিক এক কিলোমিটার দূরে মসজিদে জুম্মা। হযরত মুসআব ইবনে উমাইর এবং হযরত আসআদ ইবনে জুরারাহ (রাঃ) মদিনাতে জুম্মার নামাজ পড়াতেন হযরত নবী করিম (সঃ) এর হিজরত পূর্ব সময়ে। হিজরতের সময় হযরত নবী করিম (সঃ) প্রথমে কো'বায় অবস্থান নিয়েছিলেন। জুম্মার দিনে তিনি কো'বা থেকে মদিনা শহরের দিকে যাত্রা শুরু করেন। বর্তমানে যেখানে জুম্মা মসজিদ সেই সময় এটা ছিলো বনু সালিমের বস্তি। হযরত নবী করিম (সঃ) এই বস্তিতে জুম্মার নামাজ আদায় করেন। বনু সালিম গোত্রের লোকেরা এই স্মৃতিতে এখানে মসজিদ নির্মাণ করে নেয়। এই মসজিদকে মসজিদে জুম্মা এবং মসজিদে বনু সালিম বলা হতো। বর্তমানে যে মসজিদটি আছে তা বাদশা ফাহাদের সময়ে নির্মিত। এতে ৬৫০ জন মুসল্লি এক সাথে নামাজ আদায় করতে পারেন। মসজিদের বড় গম্বুজের উচ্চতা ১২ মিটার এবং মিনারের উচ্চতা ২৫ মিটার।

আমরা জুম্মাহ মসজিদ থেকে মসজিদে নববীর পথে ফিরতে সময় ড্রাইভার শাহাদত আঙ্গুল উঠিয়ে দেখালেন হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) এর খেঁজুর বাগানটি, যা এখনো আছে খেঁজুর গাছে পরিপূর্ণ।

জান্নাতুল বাকী :

জান্নাতুল বাকী মদিনার ঐ কবরস্থান যেখানে দশ হাজারের মতো সাহাবীকে কবর দেওয়া হয়েছে। এই কবরস্থানে হযরত নবী করিম (সঃ) এর স্ত্রী এবং সন্তানদেরকেও দাফন করা হয়েছে। তাছাড়া অসংখ্য তাবেয়ীন এবং নেক বান্দাদের কবর এখানে রয়েছে। হযরত নবী করিম (সঃ) জান্নাতুল বাকীর মুরদাদের জন্য মাফির দোয়া করেছেন। জান্নাতুল বাকীর জিয়ারত সুন্নত। জান্নাতুল বাকীর শেষ সংস্কার এবং সম্প্রসারণ হয় বাদশা ফাহাদের শাসনামলে। বর্তমানে জান্নাতুল বাকীর সীমানা হলো ১৭৪,৭৬২ মিটার এবং গোটা এলাকার চার মিটার উঁচু দেয়াল। মদিনায় থাকাকালিন সময়ে বেশ ক'বার জিয়ারতে জান্নাতুল বাকী সম্ভব হয়েছে। বাবুস সালাম দিয়ে প্রবেশ করে হযরত নবী করিম (সঃ) এবং হযরত আবু বকর, হযরত ওমর (রাঃ)'র মাজার জিয়ারত করে আমরা বেরিয়ে আসি বাবে বাকী হয়ে। একটু উত্তর দিকে এগিয়ে জান্নাতুল বাকীর সিঁড়ি। পুরাতন অংশের উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ দিক থেকে এগিয়ে এলে প্রথমে আসে হযরত আবু সাইদ খুদরী (রাঃ) এর মাজার, এরপর

হযরত উসমান (রাঃ), কিছু শহীদের কবর, মালিক এবং নাফে (রাঃ)'র কবর, আকিল ও আব্দুল্লাহ (রাঃ) এর কবর, এরপর হযরত নবী করিম (সঃ) এর সম্মানিত স্ত্রীদের কবর? তারপর হযরত নবী করিম (সঃ) এর মেয়ে জয়নব, রোকেয়া, উম্মে কুলসুম, ফাতেমা এবং নাতি হযরত হাসান (রাঃ), আর চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ) এর কবর। বাকীদের কবর আমার পক্ষে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি। সৌদি সরকার কবরগুলোর উপর কোন নিদর্শন রাখেননি যাতে জিয়ারতকারীরা বুঝতে পারেন কোনটা কার কবর।

মদিনায় বাংলাদেশীদের রুটি রুজীর হালচাল :

রুটি রুজীর উদ্দেশ্যে মদিনায় বাংলাদেশীদের অবস্থান সংখ্যায় কম নয়। মালি, রাস্তা পরিস্কার, হোটেল কর্মচারী, হোটেল-বোডিং মালিক, ওয়ার্কসপ কর্মচারী, কাপড়ের দোকানদার, মসজিদ ক্লিনার, স্টেশনারী সপ ইত্যাদি বাংলাদেশীদের প্রধান পেশাগুলোর তালিকায় রয়েছে। মসজিদে নববীর পাশে বাংলাদেশীদের ঘনবসতি রয়েছে। কেউ কেউ ফ্লাইং পান-সিগারেটও বিক্রি করেন গোপনে। মক্কা-মদিনার হরম এলাকায় পান-সিগারেট বিক্রি করা আইনত নিষিদ্ধ। সৌদি আরবের অন্যান্য স্থানের মতো মদিনায়ও কফিলদের নির্যাতন লক্ষ্যণীয়। সিলেটের গোলাপগেঞ্জর বাবু মিয়া বেশ কিছুদিন থেকে মদিনায় আছেন। তিনি একটা ওয়ার্কসপের মালিক। তিনি জানালেন তার কফিলের ভাই বড় অংকের একটি কাজ করিয়ে টাকা পরিশোধ করেনি। টাকা চাইতে গেলে বলে সফর করিয়ে দেব। সফর করানো অর্থ- একামা বাতিল করে দেশে পাঠিয়ে দেওয়া। উল্লেখ্য যে সৌদিতে ব্যবসা, চাকুরী ইত্যাদির জন্য থাকতে হলে কফিল আবশ্যক।

নুরুল হক জাফলং এর লোক। আমরা যে বোর্ডিং এ উঠেছি সেখানে অবস্থানকারী সকল বাংলাদেশী হাজীদেরকে খাবার পরিবেশনের দায়িত্ব ছিলো তার। এই খাবারের কন্ট্যাক নিয়ে কর্তৃপক্ষের আলাপ হয়েছিলো আরেক বাংলাদেশীর সাথে। কথায় না হওয়ায় দায়িত্ব পেয়েছেন নুরুল হক। এ নিয়ে নুরুল হকের সাথে ঐ ভদ্রলোকের সংঘাত। হজ্ব মন্ত্রণালয়ের অনুমতি ছাড়া এভাবে রান্নার আয়োজন সৌদি আইন মতো একটি অপরাধ। প্রতিপক্ষ ভদ্রলোক এই সুযোগকে ব্যবহার করেন নুরুল হকের বিরুদ্ধে। পুলিশ এসে নুরুল হককে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। কফিলের মাধ্যমে তিনি জেল থেকে বেরিয়ে আসেন। অন্য বাড়ীতে রান্না করে তিনি আমাদেরকে খাবার পরিবেশন করেন। নুরুল হকের এ নিয়ে বক্তব্যটা আমার অনুভূতিতে নাড়া লাগে "ভাই আমরা বাঙ্গালীই বাঙ্গালীর শত্রু। আমাদের উন্নতি কিভাবে হবে?"

আমাদের বাসার পিছনের লাক্কাতুরা চা বাগান অতিক্রম করলেই দারুস সালাম মাদ্রাসা। ছোট বেলা আমরা চা বাগানের ভেতর দিয়ে এই মাদ্রাসায় গিয়ে পড়তাম। আমাদের সাথীদের একজন ছিলো বদর। এক সময় তার সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়। ইংল্যান্ডে সে আমাদের পাশেই থাকে। বদরের খালাতো ভাই সাকিল মদিনায় থাকে। সাকিলের সাথে আমাব টেলিফোনে আলাপ হয়। একদিন বাদ ফজর সে মসজিদে নববীর সামনে আসে আমার সন্ধানে। তার সাথে সাক্ষাৎ পর্বটা বেশ মজার। আমার সাথে তার টেলিফোনে কথা হলেও কেউ কারো চেহারা জানি না। আমি তাকে খুঁজছি। আমার পাশেই সে দাঁড়ানো আরবী পোশাকে। আমি ভাবছি সে হয়তো আরব। অন্যদিকে আমার গায়েও

আরবী পোশাক। সে ভাবছে আমি হয়তো আরব। বেশ সময় চলে গেলো। প্রায় মসজিদ খালি হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ আমার মাথায় একটি কৌশল এলো- আমি অন্যদিকে চেয়ে তার পাশে গিয়ে সাকিল বলে ডাক দিলাম। কাজ হয়ে গেলো। সাকিল আমাকে নিয়ে মদিনা শহর ঘুরতে বেরুলো। সে নিজেই ড্রাইভ করছে। এক সময় আমরা বদরের ভগ্নিপতির হোটেলে গিয়ে উপস্থিত। সেখানে সকালের নাস্তা করলাম। একদিন সকালে সাকিল এসে হাজির বেশ খাবার নিয়ে। বিভিন্ন দেশী খাবার গুলো ছিলো বেশ স্বাস্থ্যসম্মত এবং সুস্বাদু।

বদরের ভগ্নিপতি মাওলানা আব্দুল আজিজ একদিন আমাদেরকে দাওয়াত করলেন তার ঘরে। ভাত-রুটি-উটের গোস্ত-সালাত-মাছ ইত্যাদি ছিলো তাঁর আয়োজনে।

আল বিদা :

হযরত নবী করিম (সঃ) এর প্রিয় শহর মদিনায় আমরা এসেছিলাম আট দিন থাকার উদ্দেশ্যে। আট দিনে চল্লিশ ওয়াক্ত নামাজ হয়। মসজিদে নববীতে চল্লিশ ওয়াক্ত নামাজ জামাতে পড়া জরুরী কিংবা হজ্বের অংশ নয়। তবু আমরা থাকলাম আট দিন। ১৩ ফেব্রুয়ারী আমাদের বিদায়ের পালা। বাদ ফজর মনের মধ্যে ব্যথা অনুভব করলাম মদিনা ছেড়ে যাচ্ছি ভেবে। শেষ বারের মতো রওজা শরীফের দিকে অগ্রসর হলাম জিয়ারতের উদ্দেশ্যে। হঠাৎ হৃদয়ে কাকুতি অনুভব করলাম "রিয়াজুল জান্নাতে" দু'রাকাত নামাজের। হযরত নবী করিম (সঃ) এর হাদিস-

"আমার রওজা ও মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানে বেহেস্তের একটি বাগান আছে। আর আমার মিম্বর হাউজে কাওছারের উপর অবস্থিত।" রিয়াজুল জান্নাত শব্দের অর্থ হলো বেহেশতের বাগান। দু'রাকাত নামাজ, কোরআন তেলাওয়াতের চেষ্টায় হাজীদের প্রচন্ড ভীড়। মহান আল্লাহ পাকের হাজারো শোকর শুক্রবারে জুম্মার নামাজ আদায় করি মিম্বরের কাছাকাছি। বিদায়ের বেলা হৃদয়ে কাকুতি থাকলেও ধাক্কা-ধাক্কি করে অন্যকে কষ্ট দিয়ে নফল ইবাদতের পক্ষে আমি নই। আমি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকলাম যদি সুযোগ পাই তবে ভেতরে যাবো। আল্লাহর মেহেরবাণীতে এক সময় খুব ভালোই সুযোগ পেয়ে গেলাম ধাক্কা-ধাক্কি ছাড়া। ভেতরে এতই মানুষ যে একজন অন্যজনের উপর সেজদা দিয়ে নামাজ আদায় করছেন। আমি একটা পিলারের পাশে দাঁড়িয়ে ভাবছি ধাক্কা-ধাক্কির মধ্যে নামাজ পড়বো কি ভাবে? এরই মধ্যে পিলারের পাশ থেকে একজন লোক নামাজ শেষ করে বেরিয়ে গেলে আমি এই স্থানে দাঁড়িয়ে যাই। ধাক্কাটা আসে পিছন থেকে। আমার পিছনে পিলার থাকায় খুব শান্ত ভাবে দু'রাকাত নামাজ আদায় করি। নামাজ শেষে দোয়া এবং বিদায়ী সালাম জানিয়ে বেরিয়ে আসি রওজা শরিফ থেকে। এই দিন বাদ এশা আমরা মদিনা থেকে আবার প্রাইভেট গাড়ী নিয়ে মক্কার পথে যাত্রা শুরু করি।

মদিনা থেকে মক্কা :

আমাদের গাড়ী মদিনা থেকে মক্কার পথে এগিয়ে যাচ্ছে। খুব সুবিধা হলো ড্রাইভার কিছুটা ইংরেজী এবং উর্দু জানে। আরবদের মধ্যে বিশেষ করে সৌদি আরবে এমন লোকের সংখ্যা খুব কম। মদিনার দিক থেকে আগত হজ্ব যাত্রীদের মিকাত হলো যুলহুলাইফা, যা মদিনা থেকে ছ'মাইল দূরে অবস্থিত। বিদায় হজ্বের সময় হযরত নবী করিম (সঃ) এই স্থান থেকে

ইহরাম বেঁধে হজ্বের নিয়তে মক্কার পথে যাত্রা শুরু করেছিলেন। আমাদের গাড়ী এসে থামলো যুলহুলাইফা মসজিদের পাশে। আর্কষণীয় মডেলের মসজিদ, সর্বত্র বিদ্যুতের আলোতে ঝলমল, অজু-গোসল-টয়লেটের অত্যাধুনিক সুব্যবস্থা, মসজিদের ভেতর চমৎকার খেজুরের বাগান, সার্বক্ষণিক পাখীদের কিচির মিচির শব্দ। আমরা বেশ সময় মসজিদের ভেতরে কাটিয়ে দিলাম। অজু-গোসল শেষে ইহরাম বেঁধে দু'রাকাত নফল নামাজ পড়ে গাড়ীতে উঠলাম। গাড়ী চলছে মক্কার পথে, আমরা মাঝে মধ্যে তালবিয়া দিচ্ছি উচ্চ কণ্ঠে। হযরত নবী করিম (সঃ) বিদায় হজ্বের সময় মদিনা থেকে মক্কায় পৌঁছেছিলেন নয় দিনে আর আমরা মক্কায় পৌঁছলাম মাত্র কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে- মধ্যরাতে। আমরা কেউ কেউ যখন এই কষ্টটুকু সহ্য করতে পারছিলাম না তখন আমি ভাবিত হই হযরত নবী করিম (সঃ) ও সাহাবীদের (রাঃ) নয় দিনের সফরের কষ্ট নিয়ে। আমাদের গাড়ী এসে থামলো হোটেলের সামনে। আমরা মালপত্র রেখে উমরার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গেলাম। বাবে উমরার দিকে প্রবেশ করে সবুজ বাতির চিহ্ন থেকে দৌড়তে শুরু করলাম। প্রথম তিন চক্কর জোর পায়ে বুক টান করে এবং পরবর্তী চার চক্কর স্বাভাবিক ভাবে আদায় করলাম। এটাই তোয়াফের সুন্নত। তোয়াফ শেষে মাকামে ইব্রাহীমকে সামনে রেখে মসজিদুল হারামে দাঁড়িয়ে দু'রাকাত নামাজ পড়লাম। মূলত সুন্নাহ হলো মাকামে ইব্রাহীমে দাঁড়িয়ে এই দু'রাকাত নামাজ পড়া। (মুসলিম শরিফ)। কিন্তু তোয়াফকারীদের প্রচন্ড ভীড় থাকায় এখানে না দাঁড়িয়ে মসজিদে চলে গেলাম। নামাজের প্রথম রাকাতে ''কুলহুয়াল্লাহু আহাদ'' এবং দ্বিতীয় রাকাতে ''কুলইয়া আয়্যুহাল কাফেরূন'' পড়া সুন্নত। (মুসলিম শরিফ)। নামাজ শেষে সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে সাত চক্কর দিয়ে মারওয়া পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে সাফা পাহাড়ের দিকে চেয়ে মন খুলে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলাম। এরপর জমজম কূপে তৃপ্ত হয়ে পানি পান করে সেলুনে এসে চুল কেটে ঘরে ফিরলাম। গোসল করে এহরামের কাপড় খুলে স্বাভাবিক জীবন শুরু করি।

হজ্ব-এ-আকবর :

হজ্ব-এ-আকবর অর্থ বড় হজ্ব। আমাদের অনেকের ধারণা হজ্ব যদি শুক্রবারে হয় তা হজ্ব-এ-আকবর, অনেকে এটাকে বলেন আকবরী হজ্ব। আকবরী হজ্ব হলে নাকি সৌদি সরকারের পক্ষ থেকে উপহার দেওয়া হয়। উপহার যাতে দিতে হয় না সে জন্য সৌদি সরকার হজ্ব শুক্রবারে হলেও অন্য দিন নিয়ে যায়। প্রকৃত পক্ষে এধারণাটি সম্পূর্ণ ভুল। হজ্ব যে কোন দিন হোক তাকে হজ্ব-এ-আকবর বলা হয়। আর উমরাকে বলা হয় হজ্ব-এ-আছগর, অর্থাৎ ছোট হজ্ব।

হজ্ব-এ-আকবরের কার্যক্রম :

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ বলেন- হযরত রাসুল (সঃ) দীর্ঘ নয় বছর হজ্ব না করে মদিনায় ছিলেন। দশম বছরে ঘোষণা করা হলো- এ বছর হযরত রাসুল (সঃ) হজ্বে যাবেন। হযরত রাসুল (সঃ) হজ্বে যাবেন সংবাদ পেয়ে মদিনায় প্রচুর লোকের আগমন ঘটলো। অতঃপর আমরা হযরতের সাথে হজ্বে রওয়ানা হলাম। যুলহুলাইফা পৌঁছার পর হযরত আবু বকরের স্ত্রী আছমা বিনতে উমাইছ প্রসব করলেন মোহাম্মদ বিন আবু বকরকে। অতএব আছমা লোক মাধ্যমে হযরত রাসুল (সঃ) কে জিজ্ঞাস করলেন- এখন আমি কি করবো?

হযরত রাসুল (সঃ) বললেন- তুমি গোসল কর এবং কাপড়ের নেক্ড়া দিয়ে লেঙ্গুট পরে ইহরাম বাঁধ। হযরত জাবের (রাঃ) বলেন- এ সময় হযরত রাসুল (সঃ)মসজিদে (দু'রাকাত ইহরামের) নামাজ পড়লেন অতঃপর কাছওয়া উটনীতে সওয়ার হলে বায়দা নামক স্থানে উটনী তাঁকে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। হযরত রাসুল (সঃ) আল্লাহ পাকের তাওহীদ সম্বলিত তালবিয়া পড়লেন-

"লাব্বাইকাল্লাহুম্মা লাব্বাইক; লাব্বাইকা লা-শারীকা-লাকা লাব্বাইক। ইন্নালহামদা-ওয়ান ন্য'মাতা লাকা ওয়াল্-মুলকা লা-শারীকা-লাকা।"

হযরত যাবের (রাঃ) আরো বলেন- আমরা হজ্ব ছাড়া অন্য কিছুর নিয়ত করি নাই। আমরা উমরার কথা জানতাম না (অর্থাৎ হজ্বের সাথে যে উমরার নিয়ত করা যায়)। বায়তুল্লাহর হেরেমে পৌছার পর হযরত নবী করিম (সঃ) "হাজরে আসওয়াদ" হাত দিয়ে স্পর্শ করে চুমা দিলেন, অতঃপর সাতবার বায়তুল্লাহ প্রদক্ষিণ করলেন। প্রথম তিন চক্করে জোরে পদক্ষেপ করলেন এবং পরবর্তী চার চক্কর স্বাভাবিকভাবে। অতঃপর মাকামে ইব্রাহীমের দিকে অগ্রসর হয়ে পবিত্র কোরআনের এই আয়াত পাঠ করলেন-

وَالتَّخِذُوْ مِنْ مَقَامِ اِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى

ঃ "এবং মাকামে ইব্রাহীমকে নামাজের স্থানে পরিণত কর।" এ সময় হযরত (সঃ) দু'রাকাত নামাজ পড়লেন নিজের এবং বায়তুল্লাহর মধ্যখানে মাকামে ইব্রাহীমকে রেখে। এই দু'রাকাতের প্রথম রাকাতে "কুলহুয়াল্লাহু আহাদ" এবং দ্বিতীয় রাকাতে "কুলইয়া আয়্যুহাল কাফেরূন" পড়লেন। এরপর "হাজরে আসওয়াদে স্পর্শ করে চুমু দিলেন। অতঃপর সাফা পাহাড়ের নিকট গিয়ে পবিত্র কোরআনের এই আয়াত পড়লেন-

اِنّ الصّفَا وَ الْـمَــرْوَةَ مِنْ شَعَآئِـرِ اللهِ

ঃ "নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শন সমুহের অর্ন্তগত।"

এবং বললেন-

اَبْـدَأُ بِـمَا بَدَأَ اللّٰهُ بِــه

"আমি এটা ধরে শুরু করবো আল্লাহ যা ধরে আরম্ভ করেছেন।" সুতরাং তিনি সাফা থেকে শুরু করলেন।

হযরত (সঃ) প্রথমে সাফা পাহাড়ের ঐ অংশে দাঁড়ালেন যেখান থেকে বায়তুল্লাহ দেখা যায়। কেবলামুখী হয়ে তিনি আল্লাহর তাওহীদ ও মহিমা বর্ণনা করে বললেন-

لَآ اِلٰـهَ اِلَّااللّٰهُ وَحْــدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ـ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ علٰى كُلِّ شَـيءٍ قَـدِيْـرــ لَآ اِلٰـهَ اِلَّااللّٰــهُ وَحْـدَه اَنْـجَزَ وَعْدَهُ وَ نَصَرَ عَبْدَهُ وَهزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ ـ

ঃ "আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই, তিনি অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নাই, তাঁরই শাসন এবং তাঁরই সমস্ত প্রশংসা, তিনি সর্বশক্তিমান। আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তিনি

অদ্বিতীয়। তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন এবং তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই সমস্ত সম্মিলিত শক্তিকে পরাভূত করেছেন।" এই কথা গুলো তিনি তিনবার উচ্চারণ করে সাফা থেকে নেমে মারওয়ার দিকে হাঁটতে লাগলেন। উপত্যকা সমতলে পৌঁছে তিনি দৌড়ে তা অতিক্রম করে চড়াইতে উঠার সময় স্বাভাবিক ভাবে হেঁটে মারওয়ায় পৌঁছলেন। (যে স্থান থেকে যে স্থান পর্যন্ত দৌড়তে হয় বর্তমানে সবুজ বাতি দিয়ে চিহ্ন দেওয়া আছে)। মারওয়ায় দাঁড়িয়ে তিনি ঐ কাজ করলেন যা সাফায় করেছিলেন। সাত চক্কর শেষে তিনি মারওয়া পাহাড়ে দাঁড়িয়ে বললেন- "যদি আমি আমার ব্যাপারে পূর্বে বুঝতে পারতাম যা আমি পরে বুঝতে পেরেছি তাহলে কখনো আমি কোরবানীর পশু সাথে নিয়ে আসতাম না এবং তাকে উমরায় রূপ দান করতাম। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যাদের কোরাবানীর পশু সাথে নেই সে যেন ইহরাম খুলে ফেলে এবং এটাকে উমরায় রূপ দেয়। পাহাড়ের নীচে দাঁড়ানো লোকদের মধ্য থেকে সুরাকা বিন মালেক বিন জু'শুম দাঁড়িয়ে জানতে চাইলেন- ইয়া রাসুলুল্লাহ তা কি শুধু এ বৎসরের জন্য না চিরকালের জন্য? তখন রাসুল (সঃ) নিজ হাতের আঙ্গুল গুলো পরস্পরের ভেতর ঢুকিয়ে দু'বার বললেন-

دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ مَرَّتَيْنِ لَا بَلْ لِأَبَدٍ اَبَدٍ -

"উমরা হজ্বের মধ্যে প্রবেশ করেছে, না, বরং চিরকালে-চিরকালের জন্য।"

এসময় হযরত আলী ইয়ামন থেকে নবী করিম (সঃ) এর জন্য কোরবানীর পশু নিয়ে আসেন। (আলী (রাঃ) তখন ইয়ামনে বিচারক পদে নিযুক্ত ছিলেন)। হযরত নবী করিম (সঃ) জানতে চাইলেন- যখন তুমি ইহরাম বেঁধেছিলে তখন নিয়ত কি ছিলো? (হজ্বের-উমরার-না উভয়ের?)। তিনি বললেন- আমি এইভাবে নিয়ত করছি "হে আল্লাহ আমি ইহরাম বাঁধতেছি যেভাবে ইহরাম বেঁধেছেন তোমার রাসুল (সঃ)।" তখন নবী করিম (সঃ) বললেন- তাহলে তুমি ইহরাম খুলবে না যেহেতু আমার সাথে কোরবানীর পশু রয়েছে। হযরত জাবের (রাঃ) বলেন- যে পশু হযরত আলী ইয়ামন থেকে এনেছেন এবং যে পশু হযরত রাসুল (সঃ) এনেছেন সব মিলিয়ে পশুর সংখ্যা ছিলো এক'শ। যাদের সাথে কোরবানীর পশু ছিলো, তারা ব্যতীত বাকীরা ইহরাম খুলে মাথার চুল ছাঁটাই করলেন। অতঃপর (৮ ই জিলহজ্ব) তরবীয়ার দিন এলে যারা ইহরাম খুলে ছিলেন তাঁরা নতুন করে ইহরাম বাঁধলেন এবং (হযরত রাসুল (সঃ) এর সাথে) মিনার দিকে রওয়ানা হলেন। তথায় তাঁরা জোহর, আছর, মাগরীব, এশা এবং ফজরের নামাজ পড়লেন। অতঃপর সুর্যোদয় পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। সুর্যোদয়ের পর তিনি বললেন- নামেরায় গিয়ে যেন কেউ তাঁর জন্য তাবু খাটায়। অতঃপর তিনি রওয়ানা হয়ে গেলেন। কোরাইশদের ধারণা ছিলো হযরত (সঃ) "মাশআরুল হারাম" এর নিকটই অবস্থান করবেন। তিনি সাধারণ মানুষদের সাথে আরাফায় অবস্থান করবেন না। কিন্তু রাসুল (সঃ) অগ্রসর হয়ে আরাফায় গিয়ে দেখলেন সেখানে তাঁর জন্য তাবু তৈরী করা হয়েছে। তিনি সেখানে অবস্থান করলেন। সূর্যাস্তের পর তিনি তাঁর কাছওরা উটনীকে তৈরীর নির্দেশ দিলেন এবং তৈরী হয়ে গেলে হযরত নবী করিম (সঃ) আরানা উপত্যকায় পৌঁছে জনসাধারণের সামনে ভাষণ দেন।

সেই ভাষণে মহানবী (সঃ) বলেন- "তোমাদের একের জান ও মাল অন্যের জন্য হারাম (সকাল দিনে-মাসে-স্থানে) যেভাবে এই দিনে, এই মাসে, এই শহরে। শুনে রাখ, মুর্খতার

যুগের সকল অপকাজ, রক্তের দাবী সমূহ রহিত করা হলো, আর আমাদের রক্তের দাবী সমূহের যে দাবী আমি প্রথমে রহিত করলাম তা হলো (আমার নিজ বংশের আয়াছ) ইবনে রবীয়া ইবনে হারেছের রক্তের দাবী। বনী ছা'দ গোত্রের দুধ পান অবস্থায় হুজাইল গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করেছিলো। এমনি ভাবে জাহেল যুগের সূদ রহিত করা হলো। আমাদের সূদ সমূহের যে সূদ আমি রহিত করলাম তা হলো (আমার চাচা) আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিবের সূদ। তা সমস্ত রহিত করা হলো।

দ্বিতীয় কথা হলো- তোমাদের নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করবে। কেননা তোমরা তাদেরকে গ্রহণ করেছো আল্লাহর জামানতে এবং আল্লাহর নির্দেশে তাদের গুপ্ত অঙ্গকে তোমরা হালাল করেছো। তাদের উপর তোমাদের হক হলো তারা যেন তোমাদের গৃহের অন্য কাউকে যাইতে না দেয়, যা তোমরা অপছন্দ কর। যদি তারা তা করে তবে তোমরা তাদের উপর শাসন করবে। আর তোমাদের উপর তাদের হক হলো- তোমরা ন্যায় সঙ্গত ভাবে তাদেরকে অন্ন, বস্ত্র, (বাসস্থান)-এর ব্যবস্থা করবে।

তৃতীয় কথা হলো- আমি তোমাদের কাছে এমন এক জিনিষ রেখে যাচ্ছি যদি তোমরা তা ধরে থাক তবে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না- তা হচ্ছে আল-কোরআন।

হে লোক সকল, আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে তোমরা কি বলবে? তোমরা বলবে যে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি নিশ্চয় আল্লাহর বাণী আমাদের কাছে পৌঁছিয়েছেন, নিজ দায়িত্ব আদায় করেছেন এবং আমাদের কল্যাণ কামনা করেছেন। এই সময় নবী করিম (সঃ) তাঁর শাহাদত আঙ্গুল উঠিয়ে উপস্থিত জনতার দিকে ইঙ্গিত করে তিনবার বললেন- আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাক।

এরপর হযরত বেলাল (রাঃ) আযান দিলেন, একামত বললেন এবং হযরত নবী করিম (সঃ) জোহরের নামাজ পড়লেন। হযরত বেলাল (রাঃ) পুনঃ একামত বললে হযরত রাসুল (সঃ) আছরের নামাজ পড়লেন। জোহর এবং আছরের মধ্যখানে কোন প্রকার নফল নামাজ পড়লেন না। এরপর কাছওয়া উটনীতে উঠে অবস্থান স্থলে পৌঁছলেন যার পিছন দিক জবলে রহমতের নীচে পাথর সমূহের দিকে এবং সম্মুখে হাবলুল মাশাতক এবং অবস্থানটা ছিলো কেবলা মুখী। সুর্য ডুবে পিত্তাভ বর্ণ কিছুটা চলে না যাওয়া পর্যন্ত নবী করিম (সঃ) এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলেন। সূর্য গোলক সম্পূর্ণ নীচে অদৃশ্য হয়ে গেলে হযরত উসমানকে সওয়ারীর পিছনে বসিয়ে উট চালিয়ে মুজদালিফায় পৌঁছেন। সেখানে তিনি কেবলামুখী হয়ে আল্লাহর মহত্ত্ব, তাওহীদ, একত্ব ঘোষণা দিয়ে দোয়া করলেন। আকাশ খুব ফর্সা না হওয়া পর্যন্ত তিনি এরূপ করতে থাকলেন। সূর্যোদয়ের পূর্বেই তিনি (তাঁর চাচাতো ভাই) ফজল বিন আব্বাসকে সওয়ারীর পিছনে বসিয়ে রওয়ানা দিয়ে "বতনে মুহাচ্ছির" নামক স্থানে পৌঁছে সওয়ারীকে কিছু উত্তেজিত করলেন। অতঃপর তিনি মধ্যম পথ ধরে বড় জামরার নিকট পৌঁছে নীচের খালি জায়গা থেকে মর্মর দানার মতো সাতটি কাঁকড় মারলেন, প্রত্যেক কাঁকড় নিক্ষেপে আল্লাহু আকবার বললেন। এরপর ফিরে গেলেন কোরবানী গাহে এবং নিজ হাতে তেষট্টিটি উট কোরবানী দিলেন। বাকী যা থাকলো তা হযরত আলী (রাঃ) কে দিয়ে কোরবানী করালেন। হযরত রাসুল (সঃ) নিজের পশুতে হযরত আলী (রাঃ)কেও শরীক করলেন। নির্দেশ দিলেন প্রত্যেক কোরবানীর পশু থেকে কিছু অংশ নিতে এবং একত্রে পাকাতে। নির্দেশ মতো একটি ডেগে পাকানো হলো, সবাই মিলে গোশত খেলেন এবং শুরুয়া পান

করলেন। এরপর রাসুল (সঃ) সওয়ারীতে উঠে বায়তুল্লাহর দিকে যাত্রা শুরু করে মক্কায় যেয়ে জোহরের নামাজ পড়লেন। অতঃপর (আপন গোত্র) বনু আবদুল মুত্তালিবের নিকট পৌঁছলেন যারা জমজমের পাড়ে দাঁড়াইয়া লোকদেরকে পানি পান করাইতেছিলেন। তিনি তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন- হে বন্ধু বনু আবদুল মুত্তালিব, টানো, টানো, যদি আমি আশংকা না করতাম যে পানি পান করানোর ব্যাপারে লোক তোমাদেরকে পরাভূত করে দিবে তবে আমি নিজেও তোমাদের সাথে পানি টানতাম। তখন তারা রাসুল (সঃ)কে এক বালতি পানি দিলেন, হযরত (সঃ) কিছু পান করেন। (পূর্ণাঙ্গ ঘটনাটি মুসলিম শরিফের হাদিস থেকে সংগৃহীত)।

হজ্ব এবং উমরা :

হজ্ব এবং উমরা অভিন্নভাবে উচ্চারিত হলেও বাস্তব ক্ষেত্রে এ দুয়ে ভিন্নতা আছে। ইহরাম আর তালবিয়া উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হয়। কার্যক্ষেত্রে হজ্ব হলো- (১) তাওয়াফে বায়তুল্লাহ শরিফ (২) ছায়ী অর্থাৎ সাফা-মারওয়া পাহাড়ের দৌড়া। (৩) ওয়াকুফে আরাফাত অর্থাৎ আরাফার ময়দানে অবস্থান করা। (৪) হল্‌ক ও কছর অর্থাৎ মাথার চুল মুন্ডান অথবা ছাটান। (৫) দশ জিলহজ্বের পর দুই কিংবা তিনদিন মিনায় থাকা। (৬) "রামউল-জেমার" অর্থাৎ জামরায় কাঁকড় মারা। যাকে আমরা বলে থাকি শয়তানকে পাথর মারা।

"উমরা" হলো ছোট হজ্ব, যার শাব্দিক অর্থ হলো জেয়ারত বা দর্শন। শরয়ী অর্থ- কিছু কার্যক্রমের সাথে বায়তুল্লাহ জেয়ারত। উমরায় আরাফার ময়দানে অবস্থান করতে হয় না। হজ্বের জন্য নির্দিষ্ট সময় আছে কিন্তু উমরার জন্য নির্দিষ্ট কোন সময় নেই। তবে মক্কাবাসী হজ্বের সময় উমরা করতে পারে না। সামর্থ্য থাকলে হজ্ব ফরজ। (সুরা আল-ইমরান-৯৭)। যে হজ্বকে অস্বীকার করলো সে প্রকৃত অর্থে কুফরী করলো। হজ্ব ফরজ হয়েছে হিজরতের পর। হিজরতের পূর্বে হযরত নবী করিম (সঃ) যে হজ্ব করেছেন তা ছিলো কোরাইশদের রীতি অনুসারে। ষষ্ঠ হিজরীতে হযরত নবী করিম (সঃ) মক্কার পথে যে যাত্রা শুরু করেছিলেন তা মূলত উমরার নিয়তে- হজ্বের নিয়তে নয়। কোরাইশ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়ে তিনি ফিরে গিয়েছিলেন হোদায়বিয়ার চুক্তির মাধ্যমে। সপ্তম হিজরীতে এর কাজা আদায় করেছেন। অষ্টম হিজরীতে রক্তপাতহীন বিপ্লবের মাধ্যমে মক্কা জয় করে হযরত আত্তাব বিন আছীদকে সেখানের গভর্নর নিযুক্ত করেন। পরবর্তী মাসে হজ্বের সময় এলে আত্তাবকে আমীরুল হজ্ব অর্থাৎ হজ্বের আমীর নিয়োগ করেন। নবম হিজরীতে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) কে আমীরুল হজ্ব করে পাঠান এবং দশম হিজরীতে তিনি নিজে হজ্ব করেন। এটাই ছিলো হযরত নবী করিম (সঃ) এর ফরজ এবং বিদায়ী হজ্ব।

হজ্বের প্রকারভেদ :

হজ্ব তিন প্রকারের-

হজ্বে এফরাদ- হজ্বের মাসে উমরা ব্যতীত শুধু হজ্বের আহকাম গুলো পালন করা। এই রূপ হজ্বকারীকে মুফ্‌রিদ বলে।

হজ্বে তামাত্তো- হজ্বের মাসে প্রথমে উমরা এবং হজ্ব করাকে হজ্বে তামাত্তো বলে। এরকমের হজ্ব কারীকে "মুতামাত্তি" বলে।

হজ্বে কেরান- হজ্ব এবং উমরা এক সাথে করাকে হজ্বে কেরান বলে। এমন হজকারীকে "কারেন" বলে। হজ্বে কেরান সর্ব সম্মতিক্রমে উত্তম। এই হজ্বে ইহরামের অবস্থায় দীর্ঘদিন থাকতে হয় বলে এতে কষ্ট বেশি হয়। ইমাম আবু হানিফার মতে রাসুল (সঃ) এর একমাত্র ফরজ হজ্ব বিদায়ী হজ্বটি কেরান ছিলো।

আহকামে উমরায় ইমামদের মতানৈক্য :

ইমাম মালেক ও শাফী (রঃ) এর মতে উমরাও ফরজ। তাদের যুক্তি হলো পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক হজ্বের সাথে উমরার কথা বর্ণনা করেছেন-

وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ۔

অর্থ:- আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্ব ও উমরা কর। (সুরা বাকারা-১৯৬)।

ইমাম আবু হানিফা (রাঃ) এর মতে উমরা সুন্নত। কিন্তু কেউ যদি উমরা শুরু করে তবে যথা নিয়মে তা আদায় করা ফরজ। তার এই মতের পক্ষে হাদিস হলো- হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন- একদিন রাসুল (সঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হলো- হুজুর উমরা কি ফরজ? হুজুর বললেন- না। তবে তোমাদের জন্য উমরা করা উত্তম। (সহীহ তিরমিযী)।

হজ্বের প্রথম দিন ৮ই জিলহজ্ব :

চুল-নখ পরিস্কার করে সুন্নাতানুসারে গোসল করে সূর্যোদয়ের পর আমরা ইহরাম বাঁধি হজ্বের নিয়তে। আমাদের হজ্ব ছিলো তামাত্তো। কারিন অর্থাৎ হজ্জে কেরানকারী ছাড়া বাকী হাজীদের এভাবেই করতে হয়। অতঃপর দু'রাকাত ইহরামের নফল নামাজ পড়ে তালবিয়া শুরু করলাম। এই থেকে শুরু হয়ে গেলো ইহরামের সকল বিধি-নিষেধ। বেরিয়ে গেলাম মিনার উদ্দেশ্যে। মক্কা থেকে মিনার দূরত্ব প্রায় তিন মাইল। ৮ই জিলহজ্ব জোহর থেকে ৯ই জিলহজ্ব ফজর পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আমাদের আদায় হলো মিনায়। ৮ই জিলহজ্বের দিবাগত রাত মিনায় অবস্থানটা সুন্নত। এই রাতে অন্য কোথাও অবস্থান মাকরূহ। অতীতের বিভিন্ন দূর্ঘটনা জনিত কারণে সৌদী সরকার মিনায় বেশ উন্নত ব্যবস্থা করেছে। পৃথক পৃথক খাম্বা এবং তাবু, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা, উন্নত গোসল ও টয়লেটের ব্যবস্থা ইত্যাদি। আমাদের তাবুতে মোট ছয়জন। রাতে আমাদের তাবুতে একটা আসর জমে উঠে- তালেমী আসর। হজ্ব সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিলেন বন্ধু বরেষু মুফতি সদরুদ্দিন।

হজ্বের দ্বিতীয় দিন ৯ই জিলহজ্ব :

হজ্বের প্রধান কাজ উকূফে আরাফা অর্থাৎ আরাফার ময়াদানে অবস্থান ৯ই জিলহজ্বে। এই দিন সূর্যোদয়ের পরপরই শুরু হয়ে যায় মিনা থেকে হাজীদের আরাফার ময়দানের দিকে যাত্রা। অনেককে সূর্যোদয়ের পূর্বেও যেতে দেখা গেছে, যা মাকরূহ। মিনা থেকে আরফার দূরত্ব প্রায় ছয় মাইল। মিনা থেকে আরাফায় যাওয়ার সময় হযরতে উলামায়ে কেরামদের আমলে পাওয়া যায় নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ-

اَللّٰهُمَّ اِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَوَجْهَكَ الْكَرِيْمَ ـ اَرَدْتُ فَاجْعَلْ ذَنبِيْ مَغْفُوْراً وَ حَجِّيْ مَبْرُوراً وَارْحَمْنِيْ وَ لَاتُخَيِّبْنِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِيْ سَفَرِيْ وَاقْضِ بِعَرَفَاتٍ حَاجَتِيْ ـ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْر ـ اَللّٰهُمَّ اَجْعَلْهَا اَقْرَبَ غَدَوَتُهَا مِنْ رِضْوَانِكَ وَاَبْعَدَهَا مِنْ سِخَطِكَ ـ اَللّٰهُمَّ اِلَيْكَ غَدَوْتُ وَعَلَيْكَ اَعْتَمِدْتُ وَوَجْهَكَ اَرَدْتُ فَاجْعَلْنِيْ مِمَّنْ تُبَاهِيْ به الْيَوْمَ مَنْ هُوَ خَيْرُ مِنِّي وَاَفْضَلُ ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ والْعَافِيَةَ وَالْمَعَافَاةَ الدَّائِمَةَ فِيْ الدُّنْيَاءَ وَالْاٰخِرَةِ وَ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِه مُحَمَّدٍ وَاٰلِه وَ صَحْبِه اَجْمَعِيْنَ ـ

"হে আল্লাহ, আমি তোমারই অভিমুখী হয়েছি। তোমারই উপর নির্ভর করেছি। তোমারই সন্তুষ্টি কামনা করছি। সুতরাং আমার গুনাহ ক্ষমা করে দাও। আমার হজ্ব কবুল কর। আমার প্রতি অনুগ্রহ কর। আমাকে বঞ্চিত করো না। আমার সফরে কল্যাণ দান কর। আরাফাতে আমার প্রয়োজন পূরণ করে দাও। নিশ্চয় তুমি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ, আমার এ যাত্রাকে তোমার সন্তুষ্টি লাভের উপায় করে দাও এবং তোমার অসন্তুষ্টি দূর করার মাধ্যম বানিয়ে দাও। হে আল্লাহ, আমি তোমারই উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছি এবং তোমারই ওপর ভরসা করছি এবং তোমারই সন্তুষ্টি কামনা করছি। সুতরাং আমাকে সে সব লোকের অন্তর্ভূক্ত করে দাও যাদের নিয়ে তুমি গর্ব করবে, যারা আমার থেকে উৎকৃষ্ট ও শ্রেষ্ঠ। হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট দুনিয়া ও আখেরাতের ক্ষমা ও স্থায়ী সুস্থতা কামনা করছি। আল্লাহ তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এবং তার পরিবার পরিজন ও সমস্ত সাহাবীদের প্রতি রহমত বর্ষন করুন।"

দোয়া আরবীতে পড়া জরুরী নয়। শুদ্ধভাবে অর্থ বুঝে পড়তে পারলে উত্তম। নতুবা মাতৃভাষায় মনের কাকুতি নিয়ে যে কোন সৎ প্রার্থনা করলে চলবে। অথবা অন্য যে সব দোয়া নিজের মুখস্ত আছে তাই পড়ে নেওয়া যায়। দোয়ার জন্য কোন নির্দিষ্টতা নেই। আমাদের মুয়াল্লিমের গাড়ীতে বেশ লম্বা লাইন দিয়ে উঠতে হলো। দুঃখজনক হলেও সত্য কিছু কিছু হাজী বিশৃংখলা, ধাক্কা-ধাক্কি করেন গাড়ীতে উঠার সময়। নারীদের মধ্যেও কেউ কেউ পর্দা ভঙ্গ করে ধাক্কা-ধাক্কিতে যোগ দেন। এসব সম্পূর্ণ আদবের পরিপন্থী এবং ক্ষেত্র বিশেষ মারাত্মক পাপও। আমরা লাইনে ইচ্ছে করেই বেশ পিছনে দাঁড়ালাম। গাড়ী একটার পর আরেকটা আসছে এবং নিয়ে যাচ্ছে।

আমরা খুব শান্ত ভাবে গাড়ীতে উঠি- আনুমানিক নয়টার দিকে। এক সময় আরাফার ময়দান, মসজিদে নামীরা, জাবালে রহমত, অসংখ্য মানুষের সমাবেশ আমাদের দৃষ্টিগোচর হলো। আমরা তাসবীহ, তাহ্‌লীল, তাকবীর এবং সাথে সাথে বিভিন্ন প্রকারের দোয়া পড়তে

শুরু করি। এজন্যও নির্দিষ্ট কোন দোয়ার বিধান নেই। তবে কেউ চাইলে এ দোয়া পড়তে পারেন-

اَللّٰهُمَّ اِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَوَجْهَكَ اَرَدْتُ اللّٰهُمَّ اَغْفِرْلِى وَتُبْ عَلَىَّ وَاَعْطِنِى سُئْوْلِىْ وَوَجِّه لِى الْخَيْرَ حَيْثُ تَوَجَّهْتُ۔ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَر۔

"হে আল্লাহ, আমি তোমারই অভিমুখী হলাম। তোমার ওপর ভরসা করলাম এবং তোমারই সন্তুষ্টি কামনা করছি। হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমার তাওবাহ কবুল কর এবং আমার প্রার্থনা মঞ্জুর কর। আমি যেদিকেই ফিরি কল্যাণকে আমার অভিমুখে করে দাও। আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। আল্লাহ সর্ব মহান।"

জিলহজ্বের নয় তারিখ সূর্য ঢলে যাওয়া থেকে সুবহে সাদিক পর্যন্ত সময়ের মধ্য হতে কিছু সময় হজ্বের ইহরাম অবস্থায় আরাফার ময়দানে অবস্থান করলে বা আরাফাত অতিক্রম করলে হজ্ব আদায় হয়ে যায়। কেউ যদি তাও না করে তবে হজ্ব হবে না। সূর্য ঢলে যাওয়ার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফার ময়দানে অবস্থান করা ওয়াজিব। যদি কেউ এ সময়ের মধ্যে আরাফায় উপস্থিত হতে না পারে তাহলে আগত রাতের যে কোন সময় পৌঁছে গেলে হজ্ব আদায় হয়ে যাবে।

বিশাল আরাফার ময়দানে ইউরোপ-আমেরিকান হাজী সাহেবদের জন্য ব্যবস্থা মসজিদে নামীরা থেকে বেশ দূরে। আমাদের গাড়ী গন্তব্যে পৌঁছতে পৌঁছতে প্রায় দুপুর হয়ে গেলো। আরাফার ময়দানে প্রচুর নিম গাছ লাগানো আছে। হঠাৎ কেউ দেখলে ভাববে এটা কোন নিম বাগান। শোনা যায় এই নিম গাছ লাগানোর পরিকল্পনা এবং গাছের চারা দিয়ে ছিলেন বাংলাদেশের মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। যদি তাই সত্য হয় তবে নিম গাছের ছায়া যেভাবে হাজীদেরকে শান্তি দিচ্ছে আল্লাহ যেন তাঁর এই গোলামকে সেভাবে আশ্রয় দেন আরশের ছায়ার নীচে। আমরা একটা তাবুতে মালপত্র রেখে একটু রেস্ট নিয়ে সূর্য ঢলার পর বেরিয়ে যাই গোসল খানার সন্ধানে। এই সময় গোসল করা মুসতাহাব। গোসলের ব্যবস্থাটা তেমন সু বলা যাবে না। তবু গোসল করলাম। অবশ্য সুযোগ না থাকলে শুধু অজু করলেও চলতো।

হযরত নবী করিম (সঃ) আরাফার ময়দানে জোহর-আসর এক সাথে আদায় করেছেন। হজ্বের আমীরের ইক্তিদায় জোহরের সময়ে আসরের নামাজ পড়া সুন্নত। কিন্তু বর্তমানে বিশাল জন সংখ্যার কারণে মসজিদে নামীরার জামাতের সাথে সবার শরীক হওয়া সম্ভব হয় না। তাই হানাফী উলামাদের মতে-"যেসব হাজী মসজিদে নামীরায় অনুষ্ঠিত জোহর ও আসরের জামাতে শরীক হতে পারেন নাই তারা নিজ নিজ তাবুতে জোহরের সময় জোহরের এবং আছরের সময় আছরের নামাজ জামাতে আদায় করবেন। আমীরে হজ্বের ইক্তিদা ব্যতিত দুই ওয়াক্তের নামাজ এক ওয়াক্তে পড়া জায়েজ নয়। আমাদের কেউ কেউ মতানৈক্য করলেও আমরা হানাফী বিধানকেই মেনে নিলাম। বাকী সময় দোয়া-কোরআন তেলাওয়াত-তালবিয়াহ পাঠে কাটালাম। হযরত নবী করিম (সঃ) বলেছেন- "সর্বশ্রেষ্ঠ দোয়া আরাফার

দিনের দোয়া। এই দিনের সর্বশ্রেষ্ঠ দোয়া হলো আমি এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণ যা করেছেন। দোয়াটি নিম্নরূপ-

لَآ اِلٰهَ اِلَّااللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ - لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْر-

"আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনি অদ্বিতীয় তার কোন অংশীদার নেই। সার্বভৌম ক্ষমতা তারই এবং তারই জন্য সমস্ত প্রশংসা। তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।" (তিরমিযী)।

আরো বেশ কিছু দোয়া হাদিসের গ্রন্থ সমূহে পাওয়া যায় যা রাসুল (সঃ) আরাফার ময়দানে পাঠ করতেন। যারা শুদ্ধ করে মর্ম বুঝে আরবী বলার ক্ষমতা রাখেন না তাদের জন্য মাতৃভাষায় বিনয় কাতরতা-কাকুতি-মিনতির সাথে দোয়া করা উচিৎ।

আরাফাত থেকে মুযদালিফায় :

আসরের ওয়াক্তের সাথে সাথেই অনেক হাজী মুযদালিফার পথে যাত্রা শুরু করে দেন। আমরা যাত্রা শুরু করলাম সূর্যাস্তের পর। এটাই সুন্নত। গাড়ীতে উঠতে গিয়ে দীর্ঘ লাইন। মাগরীবের ওয়াক্ত গিয়ে এশার ওয়াক্ত হয়ে গেলো লাইনে আমাদের গাড়ীতে উঠতে-উঠতে। হাজীদের জন্য এদিন মাগরীবের নামাজ আরাফাতে কিংবা পথে পড়া জায়েজ নয়। মুযদালিফায় পৌঁছে মাগরীব এশা এক সাথে পড়া ওয়াজিব। মাসআলা হলো মুযদালিফায় পৌঁছে এক আযান এবং এক ইকামতে প্রথমে মাগরিবের ফরজ পড়ে নেওয়া। মাগরীবের সুন্নত এবং এশার সুন্নত ও বিতর পরে পড়বে। মুযদালিফায় মাগরীব এশা এক সাথে পড়ার জন্য জামাত শর্ত নয়। কেউ যদি ভুল বশত মুযদালিফায় পৌছার পূর্বে মাগরীব পড়ে নেয় তবু সে মুযদালিফায় পৌঁছে এশার সাথে মাগরীবের নামাজ আদায় করবে। আর কেউ যদি এশার ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বেই মুযদালিফায় পৌঁছে যায় তবু তাকে এশার ওয়াক্তের অপেক্ষা করতে হবে মাগরীব-এশা একত্রে পড়ার জন্য। আমরা মুযদালিফায় পৌছলাম রাত নয়টায়। সৌদী সরকার একদিনের জন্য হলে সেখানে টয়লেট-বাথরুমের সুব্যবস্থা করে দিয়েছেন। হাজীরা অবশ্য তাদের হজ্বের ফিসের সাথে এসবের খরচ দিয়ে এসেছেন। আমরা মাল-পত্র রেখে অজু করে এসে গ্রুপভিত্তিক জামাতের মাধ্যমে মাগরীব ও এশার নামাজ পড়লাম। খাওয়া-দাওয়া শেষে একটু আরাম করে উঠে রাত জাগরণ করলাম।

আরাফাত থেকে পশ্চিম দিকে তিন মাইল দূরে মুযদালিফা চারিদিকে পাহাড়ে বেষ্টিত বিশাল ময়দান। এক সাথে খোলা ময়দানে হাজীদের সংখ্যা এখানেই কিছুটা অনুমান করা যায়। চারিদিকে সাদা আর সাদা, দূর থেকে মনে হয় হাজার হাজার সাদা কবুতরের সমাবেশ। রাত গেলো কেউ ইবাদতে- কেউ ঘুমে, মূর্খদের কেউ বেহুদা গল্পেও সময় নষ্ট করছেন। মুযদালিফায় রাত অবস্থান করা সুন্নতে মুআক্কাদা। অনেককে দেখলাম ফজরের ওয়াক্তের পূর্বেই মুযদালিফা থেকে বেরিয়ে যেতে। এটা জায়েজ নয়। ফজরের নামাজের পর যদি কেউ মুযদালিফা ত্যাগ করে তবে ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। ফজরের পূর্বে মুযদালিফা ত্যাগ করলে ওয়াজীব ভঙ্গের দায়ে দম দিতে হবে। মুযদালিফা ত্যাগের সুন্নত

সময় হলো সূর্যোদয়ের এতটুকু পূর্বে যে শান্তভাবে দু'রাকাত নামাজ পড়া যায়। অনেক আছেন ওয়াক্তের পূর্বেই ফজরের নামাজ পড়ে যাত্রা শুরু করে দেন। এমন করলে প্রথমত নামাজই হবে না, তারপর সময়ের পূর্বে মুযদালিফা ত্যাগের কাফফারা হিসেবে দম দিতে হবে। তবে মহিলারা যদি ভীড়ের কারণে মুযদালিফায় না এসে মিনায় চলে যান তাহলে দম দিতে হবে না, হজ্ব আদায় হয়ে যাবে। পুরুষদের ক্ষেত্রে ভীড়ের অজুহাত অগ্রহণযোগ্য। পাহাড় বেষ্টিত বিশাল ময়দান-মুযদালিফা। ময়দানের যে কোন অংশে অবস্থান নেওয়া যাবে শুধু ''ওয়াদিয়ে মুহাসসা'' ছাড়া। এটা হলো মিনার দিকে মুযদালিফার শেষ সীমানা।

এখানেই ''আসহাবে ফীল'' (হাতিওয়ালাা বাহিনী) এর ওপর আল্লাহর গজব হিসেবে পাখিরা পাথর নিক্ষেপ করেছিলো। জামরাতে পাথর নিক্ষেপের জন্য মুযদালিফা থেকেই ছোট ছোট পাথর সংগ্রহ করে নেওয়া সুন্নত। সম্ভব না হলে যে কোন স্থান থেকে পাথর সংগ্রহ করা যায় শুধু জামারাতে ব্যবহৃত পাথর ছাড়া।

জামরাতের ইতিকথা :

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) স্বপ্নের মাধ্যমে নির্দেশ প্রাপ্ত হয়ে প্রিয় ছেলে হযরত ইসমাঈল (আঃ) কে কোরবানী করতে মিনার দিকে যাচ্ছেন। পথিমধ্যে শয়তান হযরত ইসমাঈল (আঃ) বুঝাতে লাগলো বিভিন্ন ভ্রান্ত কথা। হযরত ইসমাঈল (আঃ) তার শ্রদ্ধাভাজন পিতাকে ঘটনা জানালে তিনি পাথর নিক্ষেপ করে শয়তানকে তাড়িয়ে দেন। এভাবে তিনবার একই ঘটনা ঘটে। যে তিন স্থানে সেই সময় পাথর নিক্ষেপ করা হয়েছিলো পরবর্তীতে এই তিন স্থানে পাথর নিক্ষেপ হজ্বে বিধান করে দেওয়া হয়। বর্তমানে এই স্থান সমূহে স্তম্ভ নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে, হাজীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে ওভার ব্রীজ করে স্তম্ভকে উঁচু করে উপরে নিয়ে আসা হয়েছে। স্তম্ভ গুলোর চারিদিকে দেয়াল দিয়ে বেষ্টনী করে দেওয়া হয়েছে যাতে পাথর কোন মতে বেষ্টনীর ভেতর পড়লেই স্তম্ভ স্পর্শ করতে পারে। পাথর দিয়ে স্তম্ভ স্পর্শ করা ওয়াজীব। যদি সাতটির মধ্যে একটি পাথর স্তম্ভ স্পর্শ করতে ব্যর্থ হয় তবে দম ওয়াজীব হয়ে যাবে। এই স্তম্ভ গুলোকে বলা হয় জামারাত বা জিমার। এক বচনে বললে হবে জামরা। আর পাথর নিক্ষেপকে বলা হয় ''রমী''। সাতটি করে পাথর নিক্ষেপ করতে হয়।

হজ্বের তৃতীয় দিন ১০ই জিলহজ্ব :

প্রচন্ড ভীড়ের কারণে সূর্যোদয়ের পর ও বেশ সময় আমাদের অপেক্ষা করতে হলো মুযদালিফায়। এই সময় আমরা কোরআন তেলাওয়াত ইত্যাদিতে কাটালাম। ধাক্কা-ধাক্কি এড়াতে সবার শেষে আমরা উঠলাম গাড়ীতে। এটাই হয়তো আমাদের মুয়াল্লিমের শেষ গাড়ী। মিনায় পৌঁছতে পৌঁছতে নয়টা হয়ে গেলো। আমরা নির্দিষ্ট তাবুতে মালপত্র রেখে জামারাতের দিকে যাত্রা শুরু করলাম। তিন জামারাতের পৃথক পৃথক নাম হলো (১) জামরায়ে উলা (২) জামরায়ে উসতা (৩) জামরায়ে আকাবা।

১০ই জিলহজ্বে পাথর নিক্ষেপ করা হবে শুধু জামরায়ে আকাবায়। পাথর হবে বড় ছোলা বা খেজুরের বীজ পরিমাণ সাতটি। বড় পাথর দিয়ে রমী করা মাকরূহ। জামরায়ে আকাবায় পাথর নিক্ষেপের সময় হলো সূর্যোদয় থেকে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত সুন্নত এবং দ্বিপ্রহর

থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত জায়েজ আছে। সূর্যাস্তের পর মাকরূহ, তবে দূর্বল, অসুস্থ এবং মহিলাদের জন্য সূর্যাস্তের পরও মাকরূহ নয়। এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো বর্তমানে যেভাবে হাজীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে দিন দিনে সবার পক্ষে কি সম্ভব সূর্যাস্তের পূর্বে পাথর নিক্ষেপ করা? পাথর নিক্ষেপ করে ফিরার পথে আমি ভাবিত এই প্রশ্ন নিয়ে। পরবর্তীতে আমি অনেকের সাথে আলোচনা করি। দারুল উলূম ব্যারী ইউকে থেকে টাইটেল, দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে ইফতা এবং আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় কায়রো থেকে আরবী ভাষার উপর ডিগ্রী প্রাপ্ত আলেম বন্ধুবরেষু মুফতি সদরুদ্দীন আমার প্রশ্নের সাথে একমত হলেন এই যুক্তিতে- যেহেতু দূর্বল, অসুস্থ এবং মহিলাদের জন্য সূর্যাস্তের পর মাকরূহ নয় উজরগত কারণে তাহলে প্রচন্ড ভীড়ে মানুষের প্রাণহানীর সম্ভাবনা থাকার পরও সূর্যাস্তের পর পাথর নিক্ষেপ কেন মাকরূহ মুক্ত হবে না? মুফতি সাহেবের মতে অবশ্যই উজরের কারণে মাকরূহ হবে না, তবে তা ফতোয়া হিসেবে ব্যবহার ততক্ষণ পর্যন্ত করা যাবে না যতক্ষণ বেশির ভাগ মুফতি সাহেবের মতামত এ ব্যাপারে আসবে না। আমরা বিষয়টি নিয়ে বিবেচনার জন্য মুফতি সাহেবদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমরা প্রচন্ড ভীড় ঠেলে কোন মতে জামরায়ে উলা, জামরায়ে উস্‌তা অতিক্রম করে জামরায়ে আকাবায় পৌঁছি। হায়খোদা, চারিদিক থেকে আসা স্রোতবাহী মানব সমুদ্রের যেন এক ঘূর্ণি। আমার কাছে মনে হলো হজ্বের সব চাইতে কষ্ট এখানেই। বাস্তব অভিজ্ঞতা না হলে কাউকে অবস্থা বর্ণনা করে বুঝানো অসম্ভব। প্রথম পাথর নিক্ষেপের সাথে সাথে আমরা তালবিয়া পাঠ বন্ধ করে দিলাম, এটাই বিধান। প্রতিটি পাথর নিক্ষেপের সময় যদিও পড়ার কথা ছিলো এই দোয়া-

بِسْمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اَكْبَر - رَغمًا لِلشَّيْطَانِ وَ رَضِى لِلرَّحْمٰنِ اللّٰهُمَّ اَجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُوْراً وَذَنْباً مَغْفُوْراً وَ سَعْيَا مَشْكُوْراً -

"আমি আল্লাহর নামে কংকর নিক্ষেপ করছি। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। আমার এ কাজ শয়তানকে লাঞ্ছিত করার জন্য এবং রহমানকে সন্তুষ্ট করার জন্য। হে আল্লাহ! আমার এ হজ্বকে মাকবুল হজ্বে পরিণত কর, আমার গুনাহ ক্ষমা কর এবং আমার এ কাজকে প্রতিদানযোগ্য করে দাও।"

কিন্তু প্রচন্ড ধাক্কা-ধাক্কিতে এত দীর্ঘ দোয়া পাঠের সুযোগ পেলাম না। মনের ভেতর এ কথা গুলোকে রেখে শুধু "সুবহানাল্লাহ" এবং "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" বলে পাথর নিক্ষেপ করে দিলাম। পাথর নিক্ষেপ করে ফেরার সময় আমরা মানুষের ভীড়ে রাস্তা অনুমান করতে না পেরে অন্য পথে চলে যাই। গন্তব্যে পৌঁছতে বেশ সময় লাগে।

হজ্বের কোরবানী :

একটি সাধারণ বিধান হলো- মুসাফিরদের ওপর কোরবানী ওয়াজীব নয়। হাজী সাহেবদের মধ্যে যারা মুসাফির তাদের ক্ষেত্রেও এ বিধান প্রযোজ্য। হজ্বের সময় যে পশু জবেহ করা হয় তা মূলত শুকরিয়া স্বরূপ হজ্বের কোরবানী। আমরা অনেকে এমনকি অনেক আলেমের পর্যন্ত এ ব্যাপারটি সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা নেই প্রশ্ন উত্তরে বুঝলাম। মদিনা শরিফে

একজন বাংলাদেশী আলেমের হজ্ব সম্পর্কিত তা'লীমে বসে ছিলাম। একজন হাজী সাহেব মাওলানা সাহেবের কাছে প্রশ্ন করলেন যে, আমরা তো বিদেশ থেকে দেশে কোরবানী দেই, এখন যদি মিনার কোরাবানী না দিয়ে রিয়াদে দিয়ে দেই তবে কি জায়েজ হবে?

মাওলানা সাহেব উত্তর দিলেন- জায়েজ হবে না, কোরবানীটা হতে হবে হুদুদের ভেতরে।

আমি প্রশ্ন করলাম- মাওলানা সাহেব, আমার জানা মতে মুসাফিরদের উপর কোরবানী ওয়াজীব হয় না এবং আমরা হজ্বের সময় ছাড়া যে কোরবানী দেই তা'তো পৃথিবীর যে কোন স্থানে থেকে ভিন্ন স্থানে দেওয়া জায়েজ আছে। তা হলে এই দুই কোরবানীর ভেতর ব্যবধানটা কি? মাওলানা কিছুটা ক্ষুদ্ধ হয়ে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমি অনুভব করলাম তাঁর দূর্বলতা।

প্রকৃতপক্ষে হজ্বের কোরবানী আর ঈদুল আযহার কোরাবানীর মধ্যে অভিন্নতার মাঝেও বেশ ভিন্নতা আছে। মাসআলাগত দিকে ঈদুল আযহার কোরবানী বিশ্বের যে স্থানে বসে ভিন্ন স্থানে আদায় করা যাবে কিন্তু হজ্বের কোরবানী বায়তুল্লাহের হুদুদের ভেতর হওয়া ওয়াজীব। ঈদুল আযহার কোরবানী মুসাফিরদের উপর ওয়াজীব নয় এবং সম্পদশালী প্রত্যেক মুকিমের উপর ওয়াজীব। হজ্বের কোরবানী ইফরাদ আদায়কারী হাজীদের উপর মুসতাহাব; যা করলে সওয়াব না করলে গুনাহ নয়, কিন্তু হজ্বে কেরান ও হজ্বে তামাত্তু আদায়কারীর উপর ওয়াজীব। কেরান ও তামাত্তুকারীরা চুল মুন্ডানো কিংবা চুল ছাঁটার পূর্বেই কোরবানী করা ওয়াজীব। কোন হাজী সাহেব যদি শরীয়ত নির্ধারিত মালে নেসাবের মালিকের উপর যে কোরবানী ওয়াজীব তা আদায় করতে চান মুসাফির হওয়ার পরও তিনি তা পারবেন হুদুদের বাইরে যে কোন স্থানে, যে কোন দেশে কিংবা হুদুদের ভেতরেও। তাঁর সেই কোরবানী ওয়াজীব নয় মুসতাহাব হিসেবেই আদায় হবে।

মাওলানার সাথে আমার আরেকটি ব্যাপারে দ্বিমত হলো "শুকরিয়া দম।" তিনি যখন শুকরিয়া দমের ফজিলত বর্ণনা করছিলেন তখন আমি জানতে চাইলাম তা কেন? উত্তরে তিনি বললেন- হজ্বের ভেতর না জানা ভুল-ত্রুটির কাফফারা হিসেবে। আমি মানতে রাজী হলাম না যেহেতু ইসলামের সাধারণ বিধান হলো সন্দেহ প্রবণ না হওয়া। সন্দেহ বশত কোন দমের প্রয়োজন নেই। যদি জানা মত কোন ভুল হয় তবে অবশ্যই দম দেওয়া ওয়াজীব। মাওলানা আমার কথা মানতে রাজী হলেন না। শেষ পর্যন্ত মক্কায় এসে গহরপুরের মুহাদ্দিস হাফেজ মাওলানা নুর উদ্দিন আহমদ সাহেবের কাছে থেকে বিষয়টি পরিস্কার হয়ে আমার সাথে ঐক্যমতে পৌঁছলেন।

সে যাই হোক, আমরা জামরাত থেকে ফিরে মিনায় গেলাম পশু কোরবানীর উদ্দেশ্যে। একটা থেকে তিনটা পর্যন্ত বাজার বন্ধ। আমাদের ফিরে আসতে হলো তাবুতে। বাদ আসর গেলাম আবার পশুর বাজারে। এখন আর নিজের হাতে কোরবানী দেওয়া যায় না, কসাইখানায় পয়সা দিয়ে কোরবানী করাতে হয়। আমরা একটা উট কোরবানী দিলাম। কসাইখানার রেলিং এ দাঁড়িয়ে দেখলাম কিভাবে তারা উট জবেহ করে। আমাদের কোরবানী শেষে ফিরে আসি তাবুতে। অনেকে ১০ তারিখে কোরবানী করতে পারেননি ১১ তারিখে করেছেন। ১২ই জিলহজ্ব সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত কোরবানী করা যায়। তবে হজ্বে তামাত্তু ও

কেরান আদায়কারীর জন্য কোরবানী না করে চুল মুন্ডানো, এবং ইহরাম মুক্ত হওয়া জায়েজ নয়।

মাথার চুল মুন্ডানো বা ছাঁটা :

মাথার চুল মুন্ডানোকে "হলক" এবং চুল ছেঁটে ফেলাকে "কসর" বলে। উমরা বা হজ্ব কিংবা উভয়টির জন্য ইহরাম বাঁধলে তা থেকে হালাল হতে হয় হলক বা কসরের মাধ্যমে। অন্যথায় জাযা ওয়াজীব হবে। মাথার এক চতুর্থাংশ পরিমাণ চুল মুন্ডানো কিংবা ছাঁটা ইহরামমুক্ত হওয়ার জন্য ওয়াজিব। তবে উত্তম হলো সমস্ত মাথার চুল মুন্ডিয়ে ফেলা। কেউ যদি মুন্ডায় তবে সমস্ত মাথার চুল আঙ্গুলের এককের পরিমাণ ছাঁটতে হবে। বাবরীধারী চুল ব্যক্তির অতিরিক্ত সতর্কতার জন্য এক কর থেকে একটু বেশি ছাঁটা প্রয়োজন যেহেতু চুল ছোট-বড় হয়ে থাকে। মহিলাদের জন্য মাথা মুন্ডানো হারাম। তারা আঙ্গুলের একক‌র পরিমাণ চুল ছাঁটবে। চুল মুন্ডানো বা ছাঁটার পূর্বে মোচ-নখ-বগলের পশম ইত্যাদি কাটলে দম দেওয়া ওয়াজিব হয়ে যাবে।

চুল মুন্ডানো বা ছাঁটার পর যদিও হাজী সাহেবরা ইহরাম মুক্ত হয়ে যাবেন কিন্তু কা'বার তাওয়াফের পূর্বে স্বামী-স্ত্রীর দৈহিক মিলন কিংবা আনুষাঙ্গিক ক্রিয়া-কর্ম জায়েজ নয়।

মিনায় কোরবানী শেষে আমরা তাবুতে এসে একটু বিশ্রাম নিলাম। সন্ধ্যার পর চলে আসি মক্কায় আমাদের হোটেলে। এখানে এসে সেলুনে প্রচন্ড ভীড় দেখে আমরা দু'তিন জন আয়না সামনে নিয়ে নিজেরাই নিজেদের মাথার চুল মুন্ডাতে শুরু করি। পিছন দিকটা মুন্ডাতে গিয়ে অসুবিধার সম্মুখীন হলে একে অন্যকে সহযোগিতা করি। গোসল করে ইহরাম খুলে সেলাইকৃত আরবীয়ান জামা লাগিয়ে আরবদের মতো মাথায় একটা লাল রুমাল দিলাম। বিশ্ব বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ-পন্ডিত মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভীর একটি কথা কোথায় পড়ে ছিলাম এই মূহুর্তে স্মরণ না হলেও কথাটি স্মরণ আছে। তিনি বলেছিলেন- যে কোন অঞ্চলের সংস্কৃতি-পোশাক যদি ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক না হয় তবে তা দ্রুত ধারণ করতে পারলে ঐ অঞ্চলের মানুষদের সাথে মিশা সহজ হয়ে যায়। আর যত বেশি মিশা যায় ততই ইসলামের ফায়দা হয়।

তাওয়াফে কা'বা :

মিনায় রমী (শয়তান মারা), কোরবানী, চুল মুন্ডানোর পর বায়তুল্লায় তাওয়াফ করা হজ্বের ফরজ সমূহের একটি। এই তাওয়াফকে তাওয়াফে রুকন, তাওয়াফে ইযাফাহ্ অথবা তাওয়াফে যিয়ারত বলে। ১০ই জিলহজ্বের সুবহে সাদিকের পর থেকেই এ তাওয়াফের সময় শুরু হয়ে যায়। ১২ই জিলহজ্ব সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত তাওয়াফের সঠিক সময়। সূর্যাস্তের পর কেউ তাওয়াফ করলে তা আদায় হয়ে যাবে কিন্তু দম ওয়াজিব হয়ে যাবে। ১০ তারিখে তাওয়াফ করে নেওয়া উত্তম। আমি দশ তারিখ রাতেই করে নিলাম। উমরার তাওয়াফের যে বিধান হজ্বের তাওয়াফের একই বিধান। যারা তাওয়াফে কুদূমের সাথে হজ্বের সা'য়ী করে ছিলেন তাওয়াফে যিয়ারতের সময় তাদের রমল করতে হয় না। আর যারা সা'য়ী করেননি তাদের তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে রমল করতে হবে। রমল হলো বুক টান করে সৈনিকের মতো দৌড়ে দৌড়ে তাওয়াফ করা।

আমি তাওয়াফে কুদূমের সাথে হজ্বের সা'য়ী করি নাই। আমাকে প্রথম তিন চক্কর সৈনিকদের মতো দৌড়তে হলো। আমি প্রায়ই ভাবিত হতাম হজ্ব হলো আল্লাহর সামনে গোলামের কাকুতি নিয়ে দাঁড়ানো, এখানে রমল কেন? পরে দেখলাম রমলটা হলো কাফের-মুনাফেকদেরকে জানিয়ে দেওয়া আমাদের বীরত্বের কথা, আমাদের মানসিক দৃঢ়তা আর শারীরীক বলিষ্ঠতার কথা। রমল হলো প্রতিটি মুসলমান যে মুজাহিদ সে কথা মুসলিম বিদ্বেষী শক্তিপরাশক্তিকে জানিয়ে দেওয়া। আমি বুক উঁচিয়ে তাওয়াফ করছি। আর মনে মনে বলছি- হে আল্লাহ, আমাদেরকে এবং আমাদের শাসক গোষ্ঠীকে মোল্লা ওমর আর শেখ উসামার মতো সাহস দাও যাতে তারাও বুক টান করে দাঁড়াতে পারে জালেম কাফেরদের বিরুদ্ধে। তাওয়াফ এবং অন্যান্য আনুষাঙ্গিক ইবাদত করতে করতে ফজরের তাহাজ্জুদ এবং ফজরের সময় হয়ে যায়। রাতে এসে মিনায় থাকা উত্তম তবে না থাকলেও হজ্বের কোন ক্ষতি হয় না।

হজ্বের চতুর্থদিন ১১ই জিলহজ্ব :

দুপুরের পর যখন সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলতে শুরু করে সেই সময় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত তিন জামারায় পাথর নিক্ষেপ করার বিধান ১১ই জিলহজ্ব। সূর্য ঢলে যাওয়ার পূর্বে তা করা জায়েজ নয়। সূর্যাস্তের পর জামরায় পাথর নিক্ষেপকে পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরাম মাকরূহ বললেও বর্তমানে অবস্থার প্রেক্ষাপটে অনেক মুফতি সাহেবান ভিন্নমত প্রকাশ করছেন। তাদের বক্তব্য হলো দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যে সংক্ষিপ্ত সময় তা লাখ লাখ মানুষের জন্য যথেষ্ট নয়। এক সময় হাজীদের এত ভীড় হতো না বিধায় এই সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছিলো। এখন যদি কেউ ভীড় এড়াতে সূর্যাস্তের পরও পাথর নিক্ষেপ করেন তবে মাকরূহ হবে না। যাদের সাথে আলোচনা করে আমি এই উত্তর পেয়েছি তাঁরা সবাই প্রাজ্ঞ আলেম। তবু যেহেতু এখন পর্যন্ত এ ব্যাপারে লিখিত ফতোয়া আসেনি স্বীকৃত কোন ফতোয়া বিভাগ থেকে তাই এ ব্যাপারে কোন প্রকার মন্তব্য থেকে বিরত থাকলাম। তবে বিষয়টা বিবেচনা করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। আমি কিন্তু ১১ই জিলহজ্ব পাথর নিক্ষেপ করতে গেছি বাদ মাগরিব। কেউ যদি ১২ই জিলহজ্ব সুবহে সাদিকের পূর্বে ১১ই জিলহজ্বের পাথর নিক্ষেপ করতে ব্যর্থ হয় তবে তার উপর কাযা-কাফফারা দু'টাই ওয়াজীব। মহিলা এবং দূর্বল লোকদের জন্য পাথর নিক্ষেপ রাতেই উত্তম। প্রতিটি জামারায় সাতটি করে পাথর মারতে হবে। পাথর হবে খেজুরের বীজের মতো ছোট-ছোট। স্মরণ রাখতে হবে অবহেলায় কিংবা ইচ্ছাকৃত ভাবে কেউ যেন কষ্ট না পায়।

হজ্বের পঞ্চম দিন ১২ই জিলহজ্ব :

১১ই জিলহজ্বের জামারাতে পাথর মেরে আমরা মিনায় তাবুতে এসে থাকলাম। ১২ই জিলহজ্ব জোহরের নামাজ শেষে গিয়ে আবারও জামারাতে পাথর মারলাম সাতটি করে মোট ২১টি। এরপর ফিরে আসি মিনায় তাবুতে। রাত এখানেই কাটাই।

যারা তাওয়াফে জিয়ারত সম্পন্ন করেননি তারা আজ সূর্যাস্তের পূর্বে অবশ্যই করে নিতে হবে। ১২ই জিলহজ্ব পাথর নিক্ষেপের কেউ ইচ্ছে করলে সূর্যাস্তের পূর্বে মক্কায় ফিরে আসতে পারেন। সূর্যাস্ত হয়ে গেলে আর মিনা থেকে বের হতে পারবে না, বের হওয়াটা মাকরূহ।

যারা ১২ তারিখ সূর্যাস্তের পূর্বে মক্কায় ফিরবে না তারা অবশ্যই ১৩ই জিলহজ্বে সূর্যঢলে যাওয়ার পর আবার তিন জামারাতের প্রতিটিতে সাতটি করে পাথর নিক্ষেপ করে মক্কায় ফিরতে হবে।

আমরা যখন তাওয়াফ-এ- জিয়ারতে মক্কায় গিয়ে ছিলাম তখন প্রায় মাল-পত্র সেখানে রেখে আসি। ফলে ১২ তারিখ জামারায় যাওয়ার সময়ই অবশিষ্ট মাল সাথে নিয়ে গেলাম এবং পাথর নিক্ষেপ করে মক্কার পথে যাত্রা শুরু করলাম। মিনা থেকে মক্কার পথে এই দিন গাড়ী পাওয়া খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার। আসবাবপত্র হালকা হলে হেঁটে যাওয়াই উত্তম। হেঁটে যাওয়ার জন্য সৌদি সরকার শীতাতপ নিয়ন্ত্রীত রাস্তা করে রেখেছে। জামারাত থেকে বেরিয়ে মক্কার পথে একটু অগ্রসর হলেই হাতের বাম দিকে সেই রাস্তা। গাড়ীর রাস্তা থেকে তা ভিন্ন-ফাঁড়ি পথ। আমরা একটু আরামের আশায় গাড়ীতে উঠে মহাবিপদে পড়লাম। চারিদিকে ট্রাফিক জ্যাম। হোটেলে ফিরতে অনেকটা রাত হয়ে গেলো।

মক্কায় প্রত্যাবর্তনের পর থেকে হজ্বের আহকাম শেষ হয়ে গেলো। মীকাতের বাইরের হাজী সাহেবদের জন্য শুধু একটি ওয়াজিব বাকী থাকলো- ''তাওয়াফে বিদা'' অর্থাৎ বিদায়ী তাওয়াফ। মক্কা ছাড়ার পূর্বক্ষণে তা করা উত্তম। তাওয়াফে বিদা'র নিয়ম তাওয়াফে জিয়ারতের নিয়মানুসারে।

উমরা এবং তাওয়াফ :

হজ্বের সময় অনেকে খুব বেশি উমরা করে থাকেন। উমরা খুব ফজিলতের আমল কিন্তু হজ্বের সময় তা বেশি বেশি করা অনুচিৎ। উলামায়ে কেরামদের মতে হজ্বের পূর্বে বেশি বেশি উমরা করার কারণে কেউ অসুস্থ হয়ে যেতে পারেন বিধায় হজ্বের পূর্বে অধিক উমরা মাকরূহ। তবে হজ্বের পর মাকরূহ না হলেও উত্তম হলো তাওয়াফ করা। অবশ্য উমরা করলে ১৩ই জিলহজ্বের পর থেকে করতে হবে। উমরা করার জন্য বিধান হচ্ছে মীকাতের বাইরে গিয়ে নতুন করে ইহরাম বেঁধে এসে প্রথমে বায়তুল্লাহে সাত চক্কর দেওয়া, পরে সাফা-মারওয়ায় সা'য়ী করা এবং মাথার চুল মুন্ডানো। উমরাকারীরা আয়েশা মসজিদ থেকে ইহরাম বেঁধে আসেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) মদিনা থেকে আসার পথে মীকাতে প্রবেশের পূর্বেই মাসিক রক্তস্রাবে আক্রান্ত হয়েছিলেন বিধায় প্রথম উমরা করতে পারেননি। উনার রোগমুক্তির পর হযরত রাসুল (সঃ) তাকে একটি নির্দিষ্ট স্থানে পাঠিয়ে ইহরাম বাঁধিয়ে নিয়ে আসেন। ঐ স্থানে পরবর্তীতে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠিত করা হয় 'আয়েশা' মসজিদ নামে। উমরাকারীরা ঐ ঘটনা থেকেই এই মসজিদকে মীকাত করে নিয়েছেন। আমার একটু কথা আছে এ ব্যাপারে। হযরত আয়েশা (রাঃ) অসুস্থতার কারণে যে স্থান থেকে ইহরাম বেঁধেছেন তা কি নফল উমরাকারীর কিংবা পুরুষদের জন্য মীকাত হিসেবে গণ্য করা যাবে? উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে তাহকীক করবেন। তবে সর্বসম্মতিক্রমে মতামত হলো এই সময় উমরা থেকে বেশি উত্তম তাওয়াফ। কা'বাতে ফরজ নামাজের পর তাওয়াফ থেকে শ্রেষ্ঠ কোন ইবাদত নেই। অনেকে টাকার বিনিময় উমরা করেন কিংবা করান, মক্কায় একদল উমরা ব্যবসায়ীদের উৎপাত মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। ওদের খপ্পর থেকে বাঁচা খুব মুশকিল হয়ে যায়। আমার কাছে বেশ ক'জন এসেছেন বদলী উমরা করাবো কি'না জানতে। আমি ''না'' বললে তারা নারাজ হন।

বাংলাদেশ থেকে যারা বদলী হজ্বে যান তাদেরও অনেককে উমরা ব্যবসায় জড়িয়ে যেতে আমি দেখেছি। বদলী হজ্বে যিনি পাঠিয়েছেন তার অনুমতি ব্যতীত এমন করা কতটুকু বৈধ তা বিবেচনার বিষয়।

তিরমিযী শরিফের হাদিস- একদিন হযরত আবু রাযীন (রাঃ) হযরত নবী করিম (সঃ) এর কাছে জানতে চাইলেন- ইয়া রাসুলুল্লাহ (সঃ) আমার পিতা অতি বৃদ্ধ, হজ্ব ও উমরা করার শক্তি তাঁর নেই এবং সফর করতেও তিনি সক্ষম নন।

নবী করিম (সঃ) বললেন- তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্ব ও উমরা আদায় করে নাও। উমরা ফরজ হলে তা বদলী করানোর বিধান আছে। ফরজ না হলে প্রয়োজন নেই। ইমাম আবু হানিফা (রাঃ) শুধু উমরা করাকে ফরজ বলেননি। তাই হানাফী মাজহাবের উলামাদের মতে বদলী উমরার কোন আবশ্যকতা নেই। যদি কারো শক্তি সামর্থ থাকে তবে সে বার বার উমরা করে লাভবান হোক, তাতে উপকার ছাড়া কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু উমরা ব্যবসায়ীদের দিয়ে উমরা করানোর কোন অর্থ নেই, বরং এই টাকা যদি সে কোন গরীবকে- এতিমখানায় কিংবা বিশ্বের মজলুম মুসলমানদের কল্যার্থে জিহাদ ফান্ডে দান করে তাহলে অশেষ সওয়াবের অধিকারী হবে।

যাদের ওপর হজ্ব ফরজ অথচ অসুস্থতার কারণে হজ্ব করতে পারছেন না এবং তিনি আরোগ্য হওয়ার সম্ভাবনাও নেই। তাহলে তিনি বদলী হজ্ব করাবেন। আর যদি তিনি ওসিয়ত করে মারা যান তবে তার ঋণ পরিশোধের পর সম্পদের এক তৃতীয়াংশ থেকে তা কার্যকর করা হবে। ওসিয়ত না থাকলে তাঁর ওয়ারিসদের ইচ্ছে হলে বদলী হজ্ব করাতে পারবেন। না করালে তিনি দায়বদ্ধ থাকলেও ওয়ারিসরা পাপী হবে না। যদি কেউ নিজকে অসমর্থ ভেবে বদলী হজ্ব করানোর পর হজ্ব করার মতো সক্ষম হয়ে যায় তবে সে নিজে হজ্ব করা ফরজ হয়ে যাবে। এই সময় বদলী হজ্ব নফল হিসেবে গণ্য হবে। যদি কোন মহিলার ওপর হজ্ব ফরজ হয় কিন্তু সফর সঙ্গী কোন মাহরাম পুরুষ (যে পুরুষের সামনে যাওয়া জায়েজ) না থাকে কিংবা থাকলেও ঐ ব্যক্তি নিজের খরচ বহনে অক্ষম এবং এই মহিলার কাছে নিজস্ব খরচের অতিরিক্ত নেই তাহলে সে ওসিয়ত করে যাবে যে, মৃত্যুর পর তার সম্পদ থেকে বদলী হজ্ব করানোর। এই ওসিয়তও সম্পদের এক তৃতীয়াংশে কার্যকর হবে। মাহরাম পুরুষ ছাড়া অন্য কারো সাথে হজ্বে যাওয়া হারাম। বদলী হজ্ব এমন ব্যক্তি দিয়ে করানো উত্তম যে নিজের ফরজ হজ্ব আদায় করে নিয়েছে। যদি কারো উপর হজ্ব ফরজ না হয় এবং হজ্ব না করা অবস্থায় তাকে দিয়ে বদলী হজ্ব করানো হয় তবে অনুত্তম ভাবে আদায় হয়ে যাবে। আর যদি কারো ওপর হজ্ব ফরজ হওয়ার পরও সে অনাদায়ী থাকে এবং তাকে দিয়ে বদলী হজ্ব করানো হয় তবে তা মাকরূহে তাহরীমীর সাথে আদায় হবে। বিনিময় বা পারিশ্রমিক নিয়ে বদলী হজ্ব হারাম। যিনি করবেন এবং যিনি করাবেন উভয়ই পাপী হবেন। যতটুকু হজ্ব করতে খরচ তার হবে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহন হারাম। এমনকি যার পক্ষ থেকে বদলী হজ্ব করা হচ্ছে অনুমতি ছাড়া তার টাকা থেকে মদীনা শরিফে আসা-যাওয়া এবং সেখানে থাকা-খাওয়ার খরচ নিষিদ্ধ। হজ্বের ক্ষেত্রে যদি এই হয় বিধান তাহলে টাকার বিনিময়-আয়ের উদ্দেশ্যে বদলী উমরা কিভাবে জায়েজ হবে? যারা বদলী উমরা করেন এবং করান উভয়ের সেদিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

কিছু বিক্ষিপ্ত কথা:

হজ্বের পূর্বে যারা মদীনা শরিফে যাননি তারা হজ্বের পর যেতে শুরু করেন। আমাদের এদিক শেষ। কিছুটা নিশ্চিন্ত। ঘুরি-ফিরি, তাওয়াফ এবং অন্যান্য ইবাদত করি, সেখানে অবস্থানকারী ও দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে যাওয়া বন্ধু-বান্ধব-আত্মীয়-পরিচিতজনদের সাথে মাঝে মধ্যে আড্ডা দিয়ে সময় কাটাই। একদিন দেখা হলো আরিফ ভাই (ক্যালিগ্রাফী শিল্পী আরিফুর রহমান), মাওলানা এমদাদুল হক আড়াইহাজারী, সা'দী ভাই (গল্পকার সাইমুম সাদী), আসগর ভাই (এক সময়ের ছাত্রনেতা গোলাম আসগর) প্রমুখদের সাথে। ওদের প্রত্যেকের সাথে আমার দীর্ঘ দিনের হৃদ্যতা, কেউ থেকে কাউকে পৃথক বলা যাবেনা। ওরা ঢাকা থেকে একই গ্রুপে এসেছেন মাওলানা আড়াইহাজারীর নেতৃত্বে। আরেকদিন আমি, সা'দী ভাই এবং আমার এক ভগ্নিপতি আব্দুল হান্নান তাফাদার(তাফাদার ভাই জেদ্দায় আল-বারাকা ব্যাংকের ক্যাশিয়ার) হাটতে হাটতে গেলাম সিলেট কাজির বাজার মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা হাবিবুর রাহমানের সাথে দেখা করতে। মাওলানার সাথে আমার বাবার দলীয় সম্পর্কের বাইরেও ব্যক্তিগত ঘনিষ্ট সম্পর্ক, যা অনেকটা পারিবারিক পর্যায়ে চলে গেছে। তাঁর সাথে দেখা হলো, বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে বাকীদের সাথে আলোচনা হলেও আমার সাথে তাঁর চাচা-ভাতিজা সম্পর্ক। বাংলা ক্যালিগ্রাফীর জনক আমাদের আরিফ ভাই বাংলা এবং আরবী ক্যালিগ্রাফীতে মুসলিম বিশ্বে খ্যাতি অর্জন করেছেন, ভাবতেই বুকটা গর্বে ফুলে উঠে। বায়তুল্লাহর চত্বরে আরিফ ভাইয়ের সাথে বিভিন্ন সময় মসজিদুল হারাম এবং মক্কা নগরীর বিল্ডিং গুলোর পেন্টিং নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আরিফ ভাইয়ের মতে- মক্কায় ব্যবহৃত রং মদীনায় ব্যবহৃত রং থেকে কড়া। আমি ভিন্নমত করবোনা যেহেতু রং নিয়েই তাঁর খেলা বা পেশা।

হজ্বে গিয়ে পরিচয় হলো অনেকের মতো বাংলাদেশের একজন শিক্ষকের সাথে। একদিন আমি, সা'দী ভাই এবং ঐ ভদ্রলোক একসাথে মসজিদুল হারামের বাবে মালিক ফাহাদের সামনে চলতে-ফিরতে গল্প করছিলাম। নূতন পরিচিত বন্ধুটির সাথে নাকি আমার লেখার পরিচয় বেশ পুরাতন। সা'দী ভাইকেও তিনি জানেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি আমাদেরকে দাওয়াত করলেন তার নিজ গ্রামে, সম্বর্ধনা দেবেন বলে। সা'দী ভাই হয়তো সম্বর্ধনার যোগ্য হয়েছেন, কিন্তু আমি...? না, এখনও যোগ্য হইনি। আমি ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে বললাম- ভাই, অপরাধটা এমন কি যে আমাকে আপনার গ্রামবাসীর সামনে শাস্তি দিতে হবে? অপরাধ যদি সত্য শাস্তিযোগ্য হয় তবে আপনার গ্রামে কেন? আল্লাহর বাড়ীতে (তাঁর হাতের জুতা দেখিয়ে) এটা দিয়ে আমার কপালে মারেন। আপনি আমাকে সম্বর্ধনা দেবেন কেন, আমি কে, দেশ-জাতি কিংবা মানবগোষ্টির মঙ্গলার্থে আমি এমন কি ঘটালাম যে আপনি ঘটা করে আমাকে সম্বর্ধনা দিবেন? আপনি যদি মনে করেন আমি ভাল 'মোরগা' কিংবা 'খাসী', সম্বর্ধনা চাকু দিয়ে কোরবানী দেবেন, তবে হিসাবে ভুল করছেন। আর যদি আমার যোগ্যতায় মুগ্ধ হয়ে সম্বর্ধনা দিতে চান, তবে আসুন আপনাকে দেখিয়ে দেই আমাদের থেকে কত যোগ্যরা জীবন সংগ্রামে হিমশিম খেয়ে নিভৃতে হারিয়ে যাচ্ছেন। আপনি কি পারবেন তাদের একজনের রক্ষার্থে এগিয়ে আসতে? আমার বন্ধুটি কোন উত্তর দেয়নি, আমার সাথে আর দেখাও হয়নি, আমার ঠিকানা নিলেও যোগাযোগ করেনি, হয়তো আমার বিক্ষুব্ধ কথায় সে

ক্ষুব্ধ হয়েছে, নতুবা আমি 'মোরগা' হিসেবে জবেহ হতে রাজী নয় বলে। বাংলাদেশের বুর্জোয়া-মুৎসুদ্দিবুর্জোয়াদের ভেতরই শুধু নয়, যারা আদর্শবাদের দাবীদার তাদের মধ্যেও বর্তমানে দেখা যায় সম্বর্ধনা কালচারটা খুব মারাত্মক ভাবে প্রচলিত। তা ছাড়া কেউকেটা-যে সে শুধু টাকার শক্তিতে আজকাল সম্বর্ধিত হতে দেখা যাচ্ছে। অনেক তরুণকে দেখা যায় সম্বর্ধনা ব্যবসায় কর্ম ব্যস্ত, তাদের কাছে মানুষের যোগ্যতা নির্ণয় হয় 'খাসী' কিংবা 'মোরগা' হওয়ার ভিত্তিতে। আমার কাছে একটা ছেলে এসেছিলো বেশ আগে সম্বর্ধনার প্রস্তাব নিয়ে, আমি স্বীকার করি ছেলেটির প্রতিভা আছে, দুঃখ হলো তার এই প্রতিভাকে সে অগঠনমূলক কাজে নষ্ট করে দিচ্ছে। ছেলেটিকে আমি সে কথাটি বলেছিলাম, আমার কাছাকাছি আর কোন দিন হয়নি সৌজন্যতার খাতিরেও।

আমি দেখেছি বাংলাদেশে অনেকে নিজের পকেটের টাকা খরচ করে সম্বর্ধিত হন, নিজের ঢোল নিজে বাজান, লজ্জাষ্কর ব্যাপার।

তাওয়াফে বিদা :

আমরা যারা মিকাতের বাইর থেকে এসেছি তাদের জন্য "তাওয়াফে বিদা" অর্থাৎ বিদায়ী তাওয়াফ ওয়াজিব। এই তাওয়াফকে "তাওয়াফে সদর"ও বলে। তাওয়াফের তিন প্রকার বিধান সার্বক্ষণিক অভিন্ন। মিকাতের ভেতরে অবস্থানকারী হাজীদের জন্য তাওয়াফে বিদা ওয়াজিব নয়। কোন মহিলা যদি হজ্বের সকল বিধান আদায় করে তাওয়াফে বিদার পূর্বে মাসিক রক্তস্রাবে আক্রান্ত হয়ে পড়েন এবং সুস্থ হওয়ার পূর্বে তার মাহরাম সফরসঙ্গী চলে যেতে চায় তবে এই মহিলার তাওয়াফে বিদা করতে হবে না। যদি কেউ তাওয়াফে জিয়ারতের পর নফল তাওয়াফ করে নেয় তবে তার ওপর তাওয়াফে বিদা মুস্তাহাব, অর্থাৎ করলে সোয়াব, না করলে গোনাহ নেই। আমি মক্কা ছাড়ার তিন-চার ঘন্টা পূর্বে তাওয়াফে বিদা করতে গেলাম। আমার গোটা দেহ-আত্মা কম্পিত,মর্মাহত, আতংকিত এটাই কা'বার সাথে এই সফরে শেষ দেখা। যদি আল্লাহ পাকের হুকুম হয় তবে পরবর্তীতে আসবো। হৃদয়ের কাকুতি মিশিয়ে যা মনে উঠলো তাই বলে গেলাম। তাওয়াফ শেষে যা কিছু দেখার আছে সব নতুন করে আবার দেখে কা'বার দিকে দৃষ্টি রেখে আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসি কা'বা চত্বর ছেড়ে। দ্রুত হোটেলে ফিরে মালপত্র নিয়ে বেরিয়ে যাই জেদ্দার পথে। জেদ্দা হজ্ব টার্মিনালে আমাদের একরাত থাকতে হলো। এখানে ক্লিনারের কাজে প্রচুর বাংলাদেশী আছেন। বেশ কিছু বাংলাদেশীর সাথে আলাপ হলো তাদের জীবনযাত্রা নিয়ে। তাদের আছে অনেক দুঃখ-কষ্ট-অভিযোগ।

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

অঘোষিত ক্রুসেড

জীবন-ধর্ম-সংস্কৃতি

গণতন্ত্র একটি কুফরী মতবাদ

কুরআন হাদীসের আলোকে তাবিজাত শিরক নয় কি?

লাহোর থেকে কান্দাহার

তালেবান শাসক ও শাসনের উপমা (অনুবাদ)

রমজানের মাসআলা-মাসায়েল

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সৈয়দ মবনু। সিলেটের বনেদী সৈয়দ পরিবারের কৃতি সন্তান। এই প্রজন্মের প্রতিবাদী কলম সৈনিক। বোদ্ধা পাঠক, যোদ্ধা প্রকৃতির মানস, চৈতন্যের গভীরে সংস্কৃতির প্রলেপ, আর মন-মননে সাহিত্যের বীজ তাকে অন্য দু'চারজন থেকে আলাদা করে দেয়। একে তো চোখ খোলা স্বভাব, তার উপর নাতিদীর্ঘ বিলেতের প্রবাস জীবন, অধিকন্তু অনুসন্ধিৎসু পাঠক মন তাকে সমৃদ্ধ করেছে। জীবন ঘনিষ্ঠ থেকেও বিষয়কে গভীর থেকে দেখা ও ভাবা তার স্বভাবজাত। সঙ্গত কারণেই তার লেখার ভেতর এক ধরণের ভিন্ন মাত্রিক মেজাজ ভর করে। এটাই তার স্বকীয়তা। একটি লেখক সত্তার এটাই মৌলিক দিক। একই সমতল থেকে দু'য়েক জনকে আলাদা করে চেনার-জানার-বুঝার এটাই মানদন্ড ও মাপকাঠি।

সৈয়দ মবনু, আমার স্নেহ ও প্রীতিভাজন। একেবারে কাছ থেকে তাকে জানি। ঘনিষ্ঠ ও স্বজন প্রিয়জন বলতে যা বুঝায় আমাদের সম্পর্কের দেয়ালটা ওভাবেই দাঁড়িয়েছে। স্বভাবতই তার শব্দ চয়ন, উপমা, রূপকল্প, অভিজ্ঞতার ভান্ডার, দৃষ্টিভঙ্গি আমার নখদর্পে। একটি প্রসঙ্গকে আবেগ মথিত করে তুলে ধরবার যোগ্যতা যেমন তার আছে, গভীর থেকে সুক্ষ্ম ভাবে টেনে তোলার ক্ষমতাও তার আছে।

এই বইতে পাঠক ভ্রমণ কাহিনীর আমেজ পাবেন। আধ্যাত্মিক সফর নামার নমুনাও প্রত্যক্ষ করবেন। রূঢ় বাস্তবতার মুখোমুখী একটি ভুলে যাওয়া ইতিহাস রোমন্থন করার সুযোগও পাবেন। আশা করি সকলের ভালো লাগবে। তথ্য-উপাত্তের সমন্বিত রূপ সুখ স্বপ্নের অতীতমুখি চিন্তা থেকে ভবিষ্যতের আশাবাদও জাগাবে। সত্যের নির্মমতার ভেতর শিক্ষণীয় উপকরণ গুলো ভাঁজে ভাঁজে স্থান করে নেয়। উপস্থাপনার গুণে কোন পাঠক যখন আপ্লুত হয়েও তা ধারণ করতে পারে, তখনই শিক্ষণীয় বইটি উৎরে যায়, লেখকের কপালে মুন্সিয়ানার তগমা আপনিতেই এসে লেপ্টে যায়।

স্বজন-প্রিয়জনের প্রতি মমত্ববোধ স্বাভাবিক, এটা স্বীকার করেও আমি দৃঢ়তার সাথে বলবো আমার মন্তব্যে স্বজনপ্রীতি নেই, আছে চোখের সামনে হাতে খড়ি থেকে এই মূহুর্তের পরিণত লেখক সৈয়দ মবনু সম্পর্কে অভিজ্ঞতা, লেখার ভেতর ইবাদতের স্বাদ গ্রহন চাট্টিখানি কথা নয়, তার সাথে উপভোগ্য ভাব-ভাষার সংমিশ্রন ঘটিয়ে পুস্তক নিয়ে একেবারে পাঠকের সামনে হাজির হওয়া আরো কঠিন। এখানে তার সাফল্য ও কৃতিত্ব আমার শ্লাঘার ব্যাপার, প্রাণ খুলে দোয়া করি, আল্লাহ তার কলমের প্রতিটি দাগকে শাহাদাতের খুনের দাগের মতই কবুল করুন।

মাসুদ মজুমদার
সাংবাদিক-কলামিস্ট

মাকতাবাতুল আশরাফ
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ০১১-৮৩৭৭৩০৮